মৃত্যুঞ্জয়
সুভাষ
শ্রী রাজেন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায়
S. GUPTA

মৃত্যুঞ্জয় সুভাষ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
'যুগান্তর' পত্রিকার সহকারী বার্ত্তাসম্পাদক

মূল্য এক টাকা বার আনা

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স্ লিঃ
স্বত্বাধিকারী ঃ আশুতোষ লাইব্রেরী
৫, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৯০, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ
৭৮।৬, লায়েল ষ্ট্রীট, ঢাকা

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৫৪
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৫৫
তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৫৬

মুদ্রাকর—শ্রীললিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
৮৯, লেক রোড, কলিকাতা

বড় হয়েও যিনি ছোটদের মধ্যে
আপনাকে মিশিয়ে রেখেছেন সেই
শিশুর মত সরল ও আপনভোলা
মহাপুরুষ স্বামী অসিতানন্দের কর-
কমলে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষের
জীবনকথা অর্পণ করে ধন্য হলাম।

মাকে ভালবাসতে হয় একথা যেমন সন্তানকে শেখাতে হয় না, তেমনি দেশকে ভালবাসার কথাও কাউকে বলে দেবার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু পরাধীন দেশে ঘটে তার ব্যতিক্রম। ভারতে বিদেশী শাসনের আমলে দেশপ্রেম অপরাধ বলেই গণ্য হ'ত। আজ ভারত স্বাধীন হয়েছে। পরশাসনের বজ্রবন্ধনের মধ্যে যাঁরা দেশমাতৃকার শৃঙ্খল-মোচনে অসাধ্যসাধন করেছেন তাঁদের স্মরণ করবার দিন এসেছে। নেতাজীর জীবনকথা তাই দেশের ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দিলাম। প্রায় দু'বছর আগে শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহ-যোগিতায় 'তোমাদের সুভাষচন্দ্র' রচনা করবার পর এত উপাদান আমার হাতে আসে এবং সেগুলো জগতের চক্ষে তুলে ধরবার জন্য এত প্রলুব্ধ হই যে, আর একখানা গ্রন্থ রচনা করতে থাকি। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ও সহকর্ম্মী শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে আমি অনুপ্রেরণা লাভ করি। প্রকৃতপক্ষে তাঁরই চেষ্টায় এই পুস্তক প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। মূল পাণ্ডুলিপিখানা প্রকাশ করা বিরাট ব্যয়সাধ্য মনে হওয়ায় প্রকাশক আমাকে পরামর্শ দেন যে, মহাপুরুষের জীবনকথা সকলের ক্রয়ক্ষমতার উপযোগী করে সংক্ষিপ্ত রূপে প্রকাশ করাই এখন সমীচীন, পরে বড় গ্রন্থ প্রকাশের সময় পাওয়া যাবে। আমার কাছে পরামর্শটি খুব মূল্যবান মনে হয় এবং সংক্ষিপ্ত আকারে বই প্রকাশে রাজী হই। এর জন্য হয়ত অনেক ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা। আশা করি পাঠকগণ তা মার্জ্জনা করবেন।

—গ্রন্থকার

মৃত্যুঞ্জয় সুভাষ

মাঘ মাস। কনকনে শীত পড়েছে কলকাতায়। কিন্তু সেদিন ভোর হতে না হতেই সকলে উঠে পড়েছে। মুখহাত ধুয়ে হাতে হাতে তেরঙা পতাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সব। রাস্তায় বেরিয়ে সামরিক কায়দায় পা ফেলে ফেলে গান ধরল—

"কদম কদম বঢ়ায়ে যা
খুসীকে গীত গায়ে যা।
য়হ জিন্দ্‌গী হৈ কৌম কী
(যো) কৌম পর লুটায়ে যা।…
জয় হিন্দ্‌!………"

ছেলেমেয়েদের কলকল্লোল ও তরুণের তূর্য্যকণ্ঠের সঙ্গে যুবা প্রৌঢ়ের দৃঢ়কণ্ঠ এক হয়ে জয়ধ্বনি তুলল, "নেতাজী সুভাষ-চন্দ্রকি জয়!" সেদিন তারিখ ছিল ২৩শে জানুয়ারী।

কলকাতার আকাশে সূর্য্যোদয়ের সাথে সাথে নবীন ভারতের দেদীপ্যমান ভাস্করের বন্দনা তোমরা ভোলনি নিশ্চয়ই।

সেদিন পথে প্রান্তরে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম, স্বাধীন ভারতীয় সৈন্যের শোভাযাত্রা—একটি মানুষের জন্মদিনে এত সমারোহ! একি মানুষের বন্দনা? এ দেশপ্রেমের বন্দনা—জ্বলন্ত আত্মত্যাগের, অখণ্ড নিষ্ঠার, পরাধীন জাতির পরম কামনার শিকল ছেঁড়ার বন্দনা। দেশের স্বাধীনতার জন্য যিনি 'জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য' করেছেন, দেশের মাথা আপনিই তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে। হে সর্ব্বকালের বরণীয় মহামানব সুভাষচন্দ্র, তোমায় প্রণাম করি।

চিত্তরঞ্জন তাঁর দেশসেবায় দেশবাসির কাছে নাম পেয়েছেন 'দেশবন্ধু', যতীন্দ্রমোহন পেয়েছেন 'দেশপ্রিয়', শাসমল পেয়েছেন 'দেশপ্রাণ' আর সুভাষচন্দ্র পেয়েছিলেন 'দেশগৌরব'। দেশবাসী কি জানত যে সুভাষের কৃতিত্বে তাদের দেওয়া নাম লুপ্ত হয়ে আর একটি অমর নামের হবে প্রতিষ্ঠা!

সুভাষচন্দ্র তোমার আমার মতই বাঙালীর ছেলে। পাঁচটা বাঙালীর ছেলের মতই মায়ের স্নেহে, বাপের শাসনে তাঁরও জীবনের রথ চলেছিল এগিয়ে। কিন্তু একটা অবনত জাতিকে উন্নত করবার ভার নিয়ে যাঁরা জন্মান তাঁরা সকলের সঙ্গেই পথ চলতে চলতে এগিয়ে যান এক সময়ে। সাধারণ মানুষ চেয়ে থাকে দ্রুত পদক্ষেপের পানে। সুভাষও একদিন তাঁর সঙ্গীদের ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছিলেন। তাই সঙ্গীরা তাঁকে বরণ

করে নিয়েছিল তাদের নেতারূপে। স্কুলে পড়তে পড়তেই সুভাষ সকল কাজে ছেলের দলের সর্দ্দারী করতেন।

সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয় ইংরেজী ১৮৯৭ সালে। পিতা জানকীনাথ বসু কটকের সরকারী উকিল ; তা ছাড়া মিউনিসিপ্যালিটি থেকে সুরু করে যত কিছু বড় বড় প্রতিষ্ঠান, প্রত্যেকটির মাথা। চরিত্রের মাধুর্য্য ও বিভিন্ন গুণের জন্য জানকীনাথ কটকের সমাজে খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। খুব তেজস্বী পুরুষ ছিলেন তিনি। তাঁর প্রতি কাজে প্রকাশ পেতো গভীর দেশাত্মবোধ। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি সরকারী 'রায়বাহাদুর' খেতাব বর্জ্জন করেছিলেন।

সুভাষ জন্ম নিয়েছিলেন বাংলার অগ্নিমন্ত্রের যুগে। বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদে ১৯০৫ সালে সমগ্র বাংলায় প্রবাহিত হয় এক প্রবল আন্দোলনের জোয়ার। সমগ্র জাতি মেতে ওঠে 'বন্দে মাতরম' গানে উদ্বুদ্ধ হয়ে। এই আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে। বাগ্মি-শ্রেষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিন পালের জ্বালাময়ী বক্তৃতায়, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিকদের কবিতায়, গানে ও প্রবন্ধে এবং শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির অগ্নিময়ী বাণীর প্রভাবে বাংলায় দেশাত্মবোধের অগ্নিশিখা জ্বলে ওঠে।

ইংরেজ সরকার এই আগুন নিভানোর চেষ্টা করতে লাগলেন নানা উপায়ে। বাংলার দিকে দিকে আত্মপ্রকাশ করল সন্ত্রাসবাদ। বাঙালী যুবক নির্ভীক চিত্তে প্রাণ দিতে এগিয়ে

গেল। কঠোর কারাদণ্ড, দ্বীপান্তর, ফাঁসীর মঞ্চ কোনটাই তাদের দমাতে পারলে না।

বাংলার এই আগুনের শিখা উড়িষ্যাকেও উত্তপ্ত করে তুলেছিল। কটকে তখন বাঙালীর সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় এই সমস্ত বাঙালীর অনেকেই আসর জমাতেন জানকীনাথের বাইরের ঘরে। জানকীনাথ ও তাঁর বন্ধুদের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নিয়ে যে-সব কথা হল, বালক সুভাষ নিবিষ্ট চিত্তে তা শুনতেন। এই সমস্ত আলোচনা থেকে সুভাষচন্দ্রের একটা ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, ইংরেজরা ভারতের লোকদের পদে পদে লাঞ্ছিত করতে চায়। সেই থেকেই তাঁর মনে ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা জন্মায়। দেশের বরণীয় সন্তানরা যে বিদেশী শাসন অবসানের জন্য এত নির্য্যাতন সহ্য করেছেন সেই শাসন উচ্ছেদের একটা ইচ্ছার বীজও তাঁর অন্তরে উপ্ত হয়। সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে কালে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়।

পিতার কাছ থেকে সুভাষচন্দ্র যেমন স্বাদেশীকতার দীক্ষা লাভ করেন মাতার কাছ থেকে তেমনি সেবাব্রতের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। জননী প্রভাবতীর কোমল প্রাণ সর্ব্বদা গরীবের দুঃখমোচনের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত। কেউ কোনদিন তাঁর কাছে হাত পেতে নিরাশ হয় নি। উড়িষ্যার দুই প্রলয়ঙ্করী নদী কাটজুড়ি ও মহানদীর বন্যায় প্রায় প্রতি বছর গ্রামকে-গ্রাম ভেসে যায় আর যত গৃহহারা নিরন্নের দল ভিড় করে

সহরে। কটকের এই সমস্ত নিরন্নের অনেকেই জননী প্রভাবতীর করুণাপ্রার্থী হত। তিনিও প্রাণপণে তাদের দুঃখমোচনের অগ্রণী হতেন। অন্ন, বস্ত্র, অর্থ দিয়ে তিনি তাদের দুঃখভার লাঘব করবার চেষ্টার ত্রুটী করতেন না। বালক সুভাষ মায়ের এই অন্নপূর্ণা রূপটিকে বড় ভালবাসতেন, আর সেবাব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করতেন মনে মনে। দেশের যত গরীব-দুঃখীর দুঃখমোচনের ব্রত নিয়েই তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

জননী প্রভাবতীর ধর্ম্মনিষ্ঠাও সুভাষের চরিত্রে প্রতিফলিত হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী পাঠের একজন নিষ্ঠাবান শ্রোতা ছিলেন সুভাষ। স্বামীজীর কাহিনী শুনতে শুনতে কতদিন যে সুভাষ উন্মনা হয়ে যেতেন তার ইয়ত্তা নেই। সুদূর আমেরিকার সহরে সহরে স্বামীজীর বিজয়বার্ত্তা সুভাষচন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করত! মায়ের মুখে এইসব কাহিনী বার বার শুনেও যেন তাঁর তৃপ্তি হত না। 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর' বাণীর মধ্যে সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবনের আদর্শ আবিষ্কার করেন।

এমনি আবহাওয়ার মধ্যে সুভাষচন্দ্র দেবতার ফুলটির মত বিকশিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর সুন্দর মুখখানির উপরও হৃদয়ের পবিত্রতার একটা অপরূপ শ্রী সর্ব্বদাই ফুটে উঠত। তাঁর শৈশব জীবনের ভালবাসা ও সরলতা সকলের হৃদয়কে আকৃষ্ট না করে পারত না। কিন্তু এই কোমলতার সঙ্গে

সঙ্গে প্রকাশ পেত একটা অনমনীয় দৃঢ়তা। যে কাজ 'করব' বলে একবার তিনি ঠিক করতেন, সমস্ত পৃথিবী তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বাধা দিলেও তিনি তাতে দমবার পাত্র ছিলেন না।

কিছুদিন প্রোটেষ্ট্যাণ্ট স্কুলে পড়বার পর সুভাষচন্দ্র ভর্ত্তি হলেন র‍্যাভেন্‌স কলেজিয়েট স্কুলে। অল্পদিনের মধ্যেই ছেলেদের নিয়ে সুভাষ একটা দল গড়ে তুললেন, অন্যান্য ক্লাসের ছেলেরাও তাতে যোগ দিলে। হয়ত উঁচু ক্লাসে পড়ে, আর বয়সেও অনেক বড়, এমন ছেলেও সুভাষকে সর্দ্দার বলে মেনে নিলে। সেই বয়সেই বিভিন্ন বয়সের ছেলেদের চালাবার ক্ষমতা আয়ত্ত করেছিলেন সুভাষ। পড়াশোনাতেও ক্লাসে তাঁর জুড়ি নেই। শুধু ক্লাসের মধ্যেই নয়, সারা স্কুলের সেরা ছেলে সুভাষ। ইংরেজী, সংস্কৃত, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত—প্রত্যেক বিষয়েই নম্বরের দিক দিয়ে রেকর্ডভাঙ্গা ছেলে—অঙ্কে পুরোপুরি একশো নম্বরই পায়, আর আর বিষয়ে নম্বর নব্বুইয়ের নীচে নামে না। শিক্ষকেরা এই প্রিয়দর্শন ছেলেটিকে ভালবাসতেন অন্তর দিয়ে। বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী বেণীমাধব দাসের বাঙালী-সুলভ সাধাসিধা পোযাক, সহজ পড়া শেখানোর ধারা, আর অমায়িক আচরণ সুভাষের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

সেই বয়সেই সুভাষ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বিবেকানন্দের সেবাধর্ম্মের আদর্শে। কোন বাছবিচার নাই তাঁর কাছে—আর্ত্ত-নারায়ণের সেবাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মারাত্মক রোগ উড়িষ্যার এই সকল অঞ্চলে প্রায় লেগেই আছে।

আর গরীব-দুঃখীর দল এই সকল মহামারীর কবলে প্রথমেই পড়ে। সুভাষের নেতৃত্বে ছেলের দল মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করে।

সহরে সেবার ব্যাপক কলেরা সুরু হয়। সুভাষ তখন সেকেণ্ড ক্লাসের (অধুনাতন ক্লাস নাইন) ছাত্র। সারা সহরে এক ভীষণ আতঙ্কের ছায়া। সঙ্গীদের নিয়ে তিনি অসহায় রোগীদের শুশ্রূষায় মেতে উঠলেন। এক হাতে ঔষধ, এক হাতে পথ্য নিয়ে সুভাষ দরিদ্রের দ্বারে দ্বারে চলেছেন ঔষধ বিতরণ করতে আর পথ্যের ব্যবস্থা করতে। সঙ্গে তাঁরই মত সেবাধর্ম্মে দীক্ষিত তরুণের দল।

প্রতি বছর আষাঢ় মাসে পুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা। সারা ভারতবর্ষ থেকে পুণ্যার্থী দর্শকের দল ভিড় করে পুরী সহরে! একে বর্ষাকাল, তায় পথে ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড়, সহরের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাও অপর্য্যাপ্ত—কাজেই কলেরা, আমাশায় প্রভৃতি সংক্রামক রোগও দেখা দেয় ব্যাপক-ভাবে। সুভাষের দল এই সকল যাত্রীর সেবায় ছুটে যায়। রথযাত্রার দিন পুরীর রাস্তাগুলিতে বিরাট জনসমুদ্র। সেই জনতা থেকে আর্ত্তদের উদ্ধার করে, হারানো ছেলেমেয়েদের তল্লাস করে অভিভাবকদের কাছে পৌঁছে দিয়ে, রুগ্‌ণ ও আহতদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে সুভাষের দল জনগণের আশীর্ব্বাদ কুড়িয়ে আনত।

সুভাষচন্দ্রের ভালবাসা স্কুলের সকল ছেলেকেই আকৃষ্ট

করত। তাঁর বন্ধুপ্রীতি এত গভীর ছিল যে, একটিবার যে ছেলে তাঁর সংস্পর্শে এসেছে, চিরদিনের মত তাঁর মধুর স্মৃতি তাকে আচ্ছন্ন করে রাখত। ক্লাসের প্রত্যেক ছাত্রই তাঁর অনুগামী ছিল। শিক্ষকদের সঙ্গেও তাঁর গভীর আত্মীয়তা হয়েছিল। স্কুলে পড়তে-পড়তেই বেণীবাবুর সংস্পর্শে তাঁর জীবনে আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ হয়। শৈশবে মায়ের মুখে শোনা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কাহিনী তাঁর অন্তরে গভীর ছাপ রেখে যায়। বিবেকানন্দের তেজস্বিতা, গভীর দেশপ্রীতি, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ও নির্ভরতা, কুমারব্রতের আদর্শে সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন একটা সুউচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, স্বামীজী বিবেকানন্দের জীবনকথা ও তাঁর রচনাবলী পড়ে তিনি নিজে প্রেরণা পেয়েছিলেন বলে দলের সকলকে সেগুলো পড়াবার বাসনা তাঁর মনে তীব্রভাবে জেগে ওঠে। তিনি তাদের নিয়ে কটকে এক লাইব্রেরী খুললেন এবং পরম উৎসাহে নানা বই আহরণ করে তাকে বড় করে তুললেন। মহাপুরুষদের জীবনকথা না পড়লে তাঁর সঙ্গীরা মানুষ হবে কি করে? তাই বহু চেষ্টায় তিনি গড়ে তুললেন এই লাইব্রেরী। লাইব্রেরী স্থাপন করে লোকশিক্ষার দিকে ঝোঁক চাপল। লাইব্রেরী-ঘরেই রাত্তিরে ইস্কুল বসানো হল। পালা করে ছেলেরা সব শিক্ষকতা করে। দেশের শিক্ষাভাব ঘোচাতে হবে তো!

কটকে এই সময় কলেজের ছেলেরা 'হেমচন্দ্র আশ্রম'

নামে একটা সমিতি গঠন করে তাদের প্রিয় অধ্যাপক হেমচন্দ্র সরকারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। এখানে নানাপ্রকার আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক আলোচনা চলত। বেণীবাবু এই সমিতিতে ছেলেদের নৈতিক উন্নতি ও আদর্শ সম্পর্কে উপদেশ দিতেন। সুভাষ কলেজে না পড়লেও স্কুলের মেধাবী ছাত্র, উৎসাহী কর্ম্মী বলে তাঁকে এই সমিতিতে নেওয়া হয়। এই সময় সুভাষচন্দ্রের জীবনে একটা প্রবল ঝোঁক চাপে ধর্ম্মের দিকে। বিশেষ করে স্বামীজী বিবেকানন্দের মত একটা বিরাট কিছু করবার আগ্রহ এই অল্প বয়সেই তাঁকে পেয়ে বসে।

১৯১৩ সালে র‍্যাভেন্‌স কলেজিয়েট স্কুল থেকে সুভাষ প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বৃত্তিলাভ করেন। কাজেই ব্যবস্থা হল, কলকাতায় এলগিন রোডের বাড়ীতে থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তে হবে। সুভাষচন্দ্র সংস্কৃত, গণিত ও লজিক নিয়ে আই-এ পড়তে লাগলেন। এই যুগের অধিকাংশ ছেলেদের মধ্যে একটা প্রবল আদর্শপ্রবণতা দেখা যায়। চির-কুমার থেকে দেশসেবার আদর্শ তখন ভাল ভাল ছাত্রদের একটা নেশার মত ছিল। কলকাতায় তিন নম্বর মির্জ্জাপুরের বাড়ীতে সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ছাত্রনেতারা একটি সমিতি খুলে ছাত্রদের আত্মোন্নতি-সাধনে সচেষ্ট হন। সুভাষ এই সমিতিতে যোগ দেন।

কিন্তু ধর্ম্মের বাতিক মাথায় চেপেই রইল। তাই হঠাৎ

একদিন কারুকে কিছু না বলে কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে সুভাষ বেরিয়ে পড়লেন হিমালয়ের পথে। উদ্দেশ্য, হরিদ্বারের দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলে যদি কোন মহাপুরুষের দর্শন পান। কিন্তু তিনি তাঁর আদর্শ-অনুরূপ কোন সাধুর সাক্ষাৎ না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে এলেন কাশীতে। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রধান শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎলাভ ঘটে। তিনি সব কথা শুনে বললেন, "বাপ-মাকে না বলে বেরিয়ে পড়েছ? ভাল কর নি। তাঁদের মনে কষ্ট দিলে কি সাধুর সাক্ষাৎ হয়? শীগ্‌গির বাড়ী ফিরে যাও, সাধুদর্শন সময়মত ঠিকই হবে।"

তাঁর কথামত সুভাষ সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়। আবার পড়া চলল পূর্ণোদ্যমে। ১৯১৫ সালে সুভাষ প্রথম বিভাগে আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এবার দর্শনশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সীতেই বি-এ পড়তে লাগলেন। প্রেসিডেন্সীতে সেই সময় মিঃ ওটেন নামে এক ইংরেজ অধ্যাপক ছিলেন। ক্লাসে পড়াতে পড়াতে তিনি প্রায়ই ভারতের প্রতি অবমাননা-সূচক উক্তি করতেন। সুভাষচন্দ্র ও কতিপয় ছাত্র তাতে ভয়ানক অপমানিত বোধ করেন এবং গভীর বেদনায় তাঁরা সেই ইংরেজ অধ্যাপককে তাঁর ঔদ্ধত্যের সমুচিত শিক্ষা দেন। এর ফলে সুভাষচন্দ্রকে দু'বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয় নি। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় তাঁকে পরীক্ষা দিবার

অনুমতি দেওয়া হয় এবং তিনি স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে সম্মানের সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে স্থান লাভ করে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজে পড়তে পড়তে ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোরে যোগ দিয়ে তিনি হাতে-কলমে কিছু কিছু সামরিক শিক্ষার আস্বাদ পান। সেই সময় থেকেই এক বিরাট বাহিনী গঠনের ইচ্ছা তাঁর মনের তলায় অঙ্কুরিত হয়। সুযোগ পেলেই তিনি সেই ইচ্ছাকে রূপ দেবার চেষ্টা করতেন। ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে তিনি যে বিরাট স্বেচ্ছা-বাহিনী গড়ে তোলেন এবং যে ভাবে জি-ও-সি রূপে স্বেচ্ছা-বাহিনীকে পরিচালিত করেন তা থেকেই তাঁর সামরিক বাহিনী গঠনের ক্ষমতা প্রকাশ পায়। সেই ক্ষমতাবলেই উত্তরকালে তিনি ভারতের মুক্তিকামী আজাদ-হিন্দ সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বি-এ পরীক্ষায় পাস করবার পর আই-সি-এস পরীক্ষার জন্য সুভাষচন্দ্রকে বিলাতযাত্রা করতে হয়। মাত্র আট মাস পড়েই তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। শুধু তাই নয়, বহু ইংরেজ ছাত্রকে টেক্কা দিয়ে ইংরেজিতে তিনি প্রথম হয়েছিলেন। কিন্তু দেশসেবার অতুলনীয় গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়ে সিভিলিয়ানী করবার মোহ তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। তাই তিনি চাকুরিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ বস্তুকে হেলায় উপেক্ষাভরে ত্যাগ করলেন—ইস্তফা দিলেন 'আই-সি-এস'এর পদবীতে এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের বি-এ (অনার্স সহ) ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। দেশসেবার এমন অকৃত্রিম নিষ্ঠা ছিল বলেই সুভাষ-চন্দ্র সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্র যখন বিলাতে যান ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়া তখন বেশ গরম। তখন সবেমাত্র অমৃতসর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, আর তা নিয়ে চলেছে দেশব্যাপী আলোড়ন। রাউলাট কমিটির রিপোর্টে ভারতের যুব-আন্দোলনের চমকপ্রদ কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। দেশের স্বাধীনতাকামী নরনারী এতে যেমন আশান্বিত হয়ে উঠেছে, বীর সন্তানদের বিয়োগ আশঙ্কায় তেমনি প্রতিটি হৃদয় হয়েছে বেদনাতুর। জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যালীলার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের দেওয়া স্যার খেতাব ছেড়ে দিলেন, গান্ধীজী অধীর হয়ে উঠলেন, ডাঃ সত্যপাল ও ডাঃ কিচলু হলেন নির্ব্বাসিত। যুবসমাজ (সুভাষ নিজেও) অতিশয় ক্রুদ্ধ। পিতার আদেশে অনিচ্ছাসত্ত্বেও গেলেন তিনি বিলাতে।

বিলাতে থেকেও তিনি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রতিটি সংবাদ রাখতেন। সমস্ত ঘটনার প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি থাকত। বিলাতে ভারতীয় আন্দোলনের প্রসারে তখন 'ইণ্ডিয়ান মজলিস' বিশেষ অগ্রণী। এর সাপ্তাহিক অধিবেশনে ভারতীয়গণ বক্তৃতা করতেন। একবার শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এমনি এক সভায় বক্তৃতা করেন। সুভাষ তাতে এত

আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তিনি এক বন্ধুকে পত্র লিখে তা জানান—"যেদিন সরোজিনী নাইডু এখানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেদিন আনন্দে বুক দশহাত ফুলে উঠেছিল। সেদিন দেখলাম, ভারতের রমণীর এমন শিক্ষাদীক্ষা ও চরিত্রগুণ আছে যে, পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আত্ম-পরিচয় দিতে পারেন।"

এই সময় ইংলণ্ডের ছাত্রমহলে সুভাষ কখন অজ্ঞাতসারেই নেতৃস্থান অধিকার করে বসেন। নেতৃত্ব করায় যেন তাঁর জন্মগত অধিকার। ভারতীয় ছাত্রদের উপর তাঁর অসামান্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত অন্তর দিয়ে। দেশসেবার ব্রত নিয়ে সুভাষ যখন 'আই-সি-এস' এ ইস্তফা দিয়ে ভারতে রওনা হলেন তখন এই শ্রদ্ধা আরও গভীর হল।

... ...

দেশসেবার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে সুভাষ ভারতে পদার্পণ করে প্রথমেই সাক্ষাৎ করলেন মহাত্মা গান্ধীর সাথে। ১৯২১ সাল সেটা। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে সারা ভারত উঠেছে কেঁপে। সুভাষ তাই প্রথমেই তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। গান্ধীজী তাঁকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। দেশবন্ধু তখন সকলের প্রিয় নেতা। তাঁর বিরাট ত্যাগ, বাগ্মিতা ও রাজনৈতিক প্রতিভাতে বাংলা তখন ঝলমল করছে। সুভাষ এলেন তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে।

দেশবন্ধু সুভাষকে পেয়ে বর্ত্তে গেলেন। তিনি যেন তাঁরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। স্কুল-কলেজের ছেলেরা তখন ইংরেজি শিক্ষার কেন্দ্রগুলি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। দেশবন্ধু শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্যে খুলেছেন ন্যাশন্যাল কলেজ। সুভাষকে তিনি এই কলেজের অধ্যক্ষ করলেন। তা ছাড়া রাষ্ট্রীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রচারবিভাগের ভারও দেওয়া হল তাঁর হাতে।

তিনি উভয় কাজই অসাধারণ নিষ্ঠা ও অপূর্ব্ব দক্ষতার সঙ্গে চালাতে লাগলেন। মুখে মুখে তাঁর নাম সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ল। আবার এই সময়েই বাংলায় আরম্ভ হল স্বেচ্ছাসেবক গঠনের আন্দোলন। সুভাষ তার নেতৃত্ব নিলেন। ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোরের অভিজ্ঞতা এখন খুব কাজে লাগল। দেখতে দেখতে তিনি সুনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গড়ে তুললেন।

বাংলার বিপ্লববাদীরা এই সময় অসহযোগ আন্দোলনে ভিড়তে চাইলেন না। তাঁরা বললেন, অসহযোগে হবে কি? অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ না করলে ফল হবে না। এমন কি তাঁরা কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করতে চাইলেন। দেশবন্ধু প্রমাদ গণলেন। তিনি কংগ্রেস আন্দোলনে বিপ্লবীদের সহযোগিতা প্রার্থনা করলেন। বিপ্লবীরা দেশবন্ধুকে ন্যাশন্যাল মিলিশিয়া (জাতীয় বাহিনী) গড়বার জন্য চাপ দিতে লাগলেন। সুভাষও তাঁদের সমর্থন করলেন। দেশবন্ধু নিরুপায় হয়ে সেপ্টেম্বর মাসে মহাত্মার সঙ্গে বিপ্লবীদের এক সম্মেলনের

আয়োজন করলেন। মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্যেরা দেশবন্ধুর বাড়ীতে সমবেত হলেন। মহাত্মার সঙ্গে বিপ্লবীদের যে আলোচনা চলে তাতে হিংসা ও অহিংসা নিয়ে তর্ক চালালেন সুভাষ। তাঁর কূটযুক্তি খণ্ডন করতে না পেরে মহাত্মা গান্ধী সমস্ত ছেড়েছুড়ে দিয়ে সন্ন্যাস নেবার ভয় দেখালেন। অবশেষে একটা মিটমাট হল।

যাই হোক, মহাত্মা ও দেশবন্ধুর অনুমতি নিয়েই সুভাষ জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গড়ে তোলার কাজে লাগলেন। তরুণেরা ছুটে এল দলে দলে। অল্প দিনের মধ্যেই তাদের সামরিক কায়দায় শিক্ষা দিয়ে গড়েপিটে নেওয়া হল। এই সময় থেকেই সুভাষচন্দ্রের মনে লড়াইয়ের ভাব প্রবল। কথায় কথায় তিনি বলতেন, "একটা সুনিয়ন্ত্রিত বাহিনী না থাকলে কোন আন্দোলনই সফল হতে পারে না। আমলাতন্ত্রকে ধ্বংস করবার জন্য আমাদের প্রত্যেক কংগ্রেস কমিটিকে এক-একটা বাহিনীতে পরিণত করতে হবে। এই সেনাবাহিনী গড়ে তোলার কল্পনা তাঁকে মাঝে মাঝে অস্থির করে তুলত। তাই আমরা সুভাষচন্দ্রকে ১৯২১ সালে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর নেতারূপে, ১৯২৮ সালে জি-ও-সি রূপে এবং ১৯৪৩ সালে আজাদহিন্দ ফৌজের অধিনায়করূপে দেখতে পাই।

১৯২১ সালের ১৭ই নভেম্বর বৃটিশ সাম্রাজ্যের যুবরাজ ভারত-পরিদর্শনে এলে কংগ্রেস সারা ভারতে যে হরতাল ঘোষণা করে, কলকাতায় তার সংগঠনের ভার নিলেন সুভাষ।

শিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক-দলের সহায়তায় তিনি কলকাতায় যে ভাবে হরতাল পালন করলেন তাতে বিরাট নগরীকে জনমানবহীন ঘুমন্তপুরী বলে মনে হল। দেশনায়কগণ সেদিন তরুণ সুভাষের সংগঠনশক্তিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

এর পরই কলকাতায় অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। ১০ই ডিসেম্বর সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর সঙ্গে গ্রেপ্তার হলেন। তিন মাস হাজতবাসের পর উভয়েরই ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল। এই কারাবাসকে সুভাষ তাঁর জীবনের মাহেন্দ্রযোগ বলে ঘোষণা করেন। কারণ এই সময় তাঁকে ও দেশবন্ধুকে একই সঙ্গে রাখা হয়। জেলের মধ্যে তিনি একাধারে দেশবন্ধুর পাচক ও প্রাইভেট সেক্রেটারী। আবার মাঝে মাঝে তাঁর শিক্ষক। দেশবন্ধু তাঁর কাছ থেকে মনস্তত্ত্ব ও নীতিদর্শনের পাঠ নিতেন। যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানী ও মনীষী, শিষ্যের কাছে শিক্ষা নিতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হন না।

১৯২২ সালে এই কারাবাসের অবসান হয়। এর কিছুদিন পরেই উত্তরবঙ্গে হল প্রবল বন্যা। বন্যায় গৃহহীন ও আশ্রয়হীনদের সাহায্যের জন্য সুভাষচন্দ্রের প্রাণ কেঁদে উঠল। আর্তের সেবায় আত্মনিবেদন করলেন তিনি উত্তরবঙ্গ প্লাবন সাহায্য সমিতির সম্পাদকরূপে। বাংলার জনসাধারণ তাঁর প্রাণঢালা সেবায় মুগ্ধ হল। সারা বাংলায় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল।

এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে গয়া সহরে কংগ্রেসের অধিবেশন

হল। এবারকার সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। কিন্তু দেশবন্ধুর আইনসভায় প্রবেশের প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হল না বলে তিনি সভাপতিপদে ইস্তফা দিলেন এবং স্বরাজ্যদল গঠন করলেন। দেশবন্ধুর সহকারীরূপে সুভাষচন্দ্র আত্মনিয়োগ করেন স্বরাজ্যদলের কাজে। এর জন্য সুভাষচন্দ্র প্রকাশ করলেন 'বাংলার কথা' নামে একখানা বাংলা সংবাদপত্র। কিছুদিন পরে প্রকাশিত হল 'ফরোয়ার্ড' নামে ইংরেজি পত্রিকা। সুভাষের পরিচালনায় এই পত্রিকা দুইটির খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সুভাষচন্দ্র এইবার আবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। ১৯২৩ সালেই সুভাষ বঙ্গীয় তরুণসঙ্ঘ নামে একটি দল গঠন করেন। দেশের কৃষক ও শ্রমিকদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে তাদের দুরবস্থা দূর করাই হল সঙ্ঘের উদ্দেশ্য।

এর পরের বছরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কলকাতা কর্পোরেশানের মেয়র নির্ব্বাচিত হলেন, এবং সুভাষচন্দ্র হলেন প্রধান কর্ম্মকর্তা। প্রধান কর্ম্মকর্তা নিয়োগের ব্যাপারে সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন। বাংলা সরকার সুভাষচন্দ্রের নিয়োগ সুনজরে দেখলেন না। নানাভাবে টালবাহানার পর অবশেষে সরকার এই নিয়োগ অনুমোদন করলেন। মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে এত বড় গুরুত্বপূর্ণ পদে আর কেউ নিযুক্ত হন নি। চীফ একজিকিউটিভ অফিসারের মাসিক বেতনের হার ছিল তিন হাজার টাকা। সুভাষচন্দ্র দেড় হাজার টাকা হিসাবে মাইনে

নিতে লাগলেন। দেশবন্ধু ও সুভাষের আমলে কর্পোরেশান নাগরিকদের হিতকারী বহু কার্য্য করে। দেশনেতাদের নামে রাস্তা ও পার্কসমূহের নাম রাখা হয়। কর্পোরেশানে বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য একটি শিক্ষাবিভাগ খোলা হয় এবং ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ফ্রি প্রাইমারী স্কুল ও দরিদ্রের জন্য ডিসপেনসারি, শিশুদের চিকিৎসাকেন্দ্র, দুগ্ধ-বিতরণকেন্দ্র খোলা হয়। জনসাধারণ কর্পোরেশানকে নিজেদের প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করতে থাকে।

সুভাষচন্দ্রকে বেশীদিন কর্পোরেশানের কাজ পরিচালনার সুযোগ দেওয়া হয় নি। এপ্রিল মাসে সুভাষচন্দ্র প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন এবং অক্টোবর মাসে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রথমে তাঁকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে ও বহরমপুর জেলে আটক রাখবার পর নির্ব্বাসিত করা হয় ব্রহ্মদেশের মান্দালয় কারাগারে।

পৃথিবীতে যাঁরা বড় হয়ে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রেখে যান তাঁদের জীবনকাহিনী পড়লে দেখা যায় যে, অনেক বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়েই তাঁদের জীবনস্রোত প্রবাহিত হয়। বেদনার মধ্য দিয়েই মহত্ত্বের বিকাশ হয়। কত বিবর্ত্তন ও বিকাশের ভিতর দিয়ে সূর্য্যের আলোকে চোখ মেলে চায় প্রভাতের শিশিরধোয়া ফুলগুলি। রাজনৈতিক নেতার মানসিক বিকাশও হয় এই ভাবেই। মান্দালয়ের কারাবাস এই জন্যই

অভিশাপের রূপে সুভাষের জীবনে এনেছিল আশীর্ব্বাদ। নির্জ্জন কারাকক্ষে তিনি গভীর সাধনায় নিমগ্ন হলেন।

সুভাষচন্দ্রের এই নির্ব্বাসন দেশবাসী নীরবে সহ্য করে নি। তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে তারা, আর কারারুদ্ধ সুভাষচন্দ্রকেই ব্যবস্থাপক সভায় তাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে।

মান্দালয় কারাবাসে সুভাষচন্দ্রের জীবনে আসে প্রথম প্রচণ্ড আঘাত। রাজনীতিক্ষেত্রে যাঁকে তিনি গুরু বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন—১৯২৫ সালের ১৬ই জুন তারিখে দার্জ্জিলিং শৈলাবাসে ভারতের সেই অবিসম্বাদী নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দেহরক্ষা করেন। সমগ্র বাংলার নরনারী হাহাকার করতে লাগল। সুভাষচন্দ্র নিজেও শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। কিন্তু গভীর শোকের সঙ্গে তাঁকে এ কথা মনে রাখতে হয়েছিল যে, বিরাট দায়িত্ব অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য। বাংলা এখন তাঁরই মুখের দিকে চেয়ে আছে।

সুভাষ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। দেশবন্ধুর বিয়োগের প্রথম আঘাতটা সামলাতে না সামলাতেই তাঁকে একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয় এবং তা নিয়ে সারা দেশে বেশ সাড়া পড়ে যায়। ১৯২৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সুভাষচন্দ্র ও মান্দালয়ের কয়েকজন রাজবন্দী অনশন ধর্ম্মঘট আরম্ভ করেন। দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা প্রভৃতি পালপার্ব্বণে গভর্ণমেণ্ট বন্দীদের

ভাতা দিতে চাহিলেন না। মানুষকে বন্দী করে রেখে তাকে তার ধর্ম্মাচরণ থেকে বঞ্চিত রাখা অত্যন্ত অন্যায়। সুভাষ এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। প্রতিবাদে সুরু হল অনশন। এই নিয়ে দেশময় আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠল। ২৪শে ফেব্রুয়ারী কর্পোরেশানের সভায় সরকারী আচরণের নিন্দা ক'রে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২৫শে ফেব্রুয়ারী কলকাতায় নাগরিকদের সভাতেও সরকারের নিন্দা করা হয়। এই তারিখেই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক জরুরী প্রস্তাব আনা হয়। কিন্তু সভাপতি তা আলোচনার অনুমতি দিলেন না। রেঙ্গুনের নাগরিকরাও এতে প্রতিবাদ জানালেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারী কলকাতার লোকেরা সরকারী আচরণের প্রতিবাদে পূর্ণ হরতাল পালন করলে। অবশেষে হার মানতে হয় সরকারকে। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দেন, মান্দালয়ের বন্দীরা ধর্ম্মানুষ্ঠানে যে অর্থ ব্যয় করেছেন তা মঞ্জুর করা হবে এবং ভবিষ্যতে পূজার্চ্চনার সুবিধা দেওয়া হবে। পনেরো দিন অনশন চলার পর বন্দীরা তাঁদের লক্ষ্য জয় করেন।

নির্জ্জন, কারাবাস, মান্দালয়ের অসহ্য গরম, দেশের জন্য উদ্বেগ ও দেশবন্ধুর অকাল-প্রয়াণ সুভাষচন্দ্রের শরীরকে জীর্ণ করে ফেললে। তাঁর দেহে প্রকাশ পেল ক্ষয়রোগের লক্ষণ। তখন তাঁকে ইনসীন জেলে স্থানান্তরিত করা হল। ১৯২৭ সালের এপ্রিলে তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। ডাক্তারী

পরীক্ষায় তাঁর অবস্থা অত্যন্ত শঙ্কাজনক বলে ঘোষণা করা হল। তবুও বাংলা সরকার সহজে তাঁকে মুক্তি দিতে স্বীকৃত হলেন না। তাঁকে সরাসরি ইউরোপে চলে গিয়ে চিকিৎসা করবার অনুমতি দিতে চাইলেন তাঁরা। সুভাষচন্দ্র ঘৃণাভরে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

অবশেষে ১৯২৭ সালের ১৬ই মে তারিখে তাঁকে বিনা সর্ত্তে মুক্তি দেওয়া হয়। দীর্ঘ আড়াই বৎসর পরে তাঁর এই মুক্তিতে দেশময় আনন্দের সাড়া পড়ে যায়।

... ...

মুক্তির অল্পকাল পরেই সুভাষচন্দ্র আবার কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রোগশয্যাও তাঁকে কোনদিন ধরে রাখতে পারেনি। দেশমাতৃকার উদাত্ত আহ্বান যার কানে পৌঁছেছে সে কি বিশ্রাম নিতে পারে? ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন। এই সময় ভারতের বড়লাট লর্ড আরুইণ ভারতের শাসন-সংস্কার সম্পর্কে এক কমিশন নিয়োগের কথা ঘোষণা করলেন। স্যর জন সাইমনকে সভাপতি করে সাতজন ইংরেজ নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন 'সাইমন কমিশন' নামেই সমধিক খ্যাত। দুঃখের কথা, এই কমিশনে কোন ভারতীয়কে স্থান দেওয়া হয় নি। ভারতবাসী তাই বর্জ্জন করলে এই কমিশন। সাইমন কমিশন বয়কটকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে সেদিন চললো তুমুল অলোড়ন।

সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলন নিয়েই সুভাষ কাজে নামলেন। ৩রা ফেব্রুয়ারী সাইমন কমিশন বোম্বাই সহরে পৌঁছানমাত্র সারা ভারত একস্বরে গর্জ্জে উঠল, "সাইমন, ঘরে ফিরে যাও।" বাংলার ছাত্রেরা সেদিন স্বেচ্ছায় স্কুল-কলেজ কামাই করে কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখালে।

এবার আর স্বরাজ্যদলের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই সুভাষচন্দ্রের কর্ম্মধারা সীমাবদ্ধ রইল না। তাঁর সামনে তখন দুমুখী কর্ম্মস্রোত। প্রথমতঃ দেশবন্ধুর মৃত্যুতে নেতৃহীন বাংলাকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা, দ্বিতীয়তঃ দেশের কাছে এমন এক কর্ম্মপদ্ধতি উপস্থিত করা যাতে সকল ভারতের লোক আকৃষ্ট হয়।

১৯২৮ সালের মে মাসে মহারাষ্ট্রীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে সুভাষ তাঁর এই কর্ম্মপন্থা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, "আমি প্রস্তাব করি যে, কংগ্রেসের উচিত প্রত্যক্ষ ভাবে শ্রমিক-সংগঠনের ভার নেওয়া এবং দেশের ছাত্র ও যুবসম্প্রদায়ের উচিত নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। দেশের নারী সমাজেরও উচিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।" তাঁর এই আহ্বানে দেশময় সারা পড়ে যায়। নানা জায়গায় গঠিত হয় ছাত্র ও যুব-প্রতিষ্ঠান।

বাংলাতে তিনি আরম্ভ করলেন স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলন। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার ৪৩তম অধিবেশন হল কলকাতা মহানগরীতে। কংগ্রেসের সভাপতি

সেবার পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর জেনারেল কম্যাণ্ডিং অফিসার রূপে সুভাষচন্দ্রের সে-কি কর্ম্ম-কুশলতা! সেনানীবেশে সুভাষচন্দ্রের সে-কি তন্ময় ভাব! নিরস্ত্র বাঙ্গালীসন্তানের প্রাণে সে-কি সামরিক উন্মাদনা! এই সেনানীর নেতৃত্বে সেদিন বিরাট স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী কলকাতার রাজপথে নির্ব্বাচিত সভাপতিকে বিপুল শোভাযাত্রা সহকারে যে সম্বর্দ্ধনা জানিয়েছিল ভারতের জাতীয় ইতিহাসে তার তুলনা বিরল।

সুভাষচন্দ্রকে দেখে সেদিন মনে হয়েছিল যেন সত্যই তিনি সেনাদল নিয়ে রণক্ষেত্রে যাচ্ছেন। ভোর না হতে-হতেই সেদিন ফুটপাথে ফুটপাথে শোভাযাত্রা-দর্শনার্থীদের ভীড় জমে গেল। প্রতি গৃহের ছাদ, বারান্দা, অলিন্দ ও বাতায়ন থেকে উৎসুক চোখের দৃষ্টি পড়ল রাজপথে। নিরস্ত্র জাতির প্রাণে সামরিক অভিলাষের উন্মেষ! সত্যই সেদিন বাংলাতে এক নূতন দিনের সূচনা হল। সুভাষ সেদিন যেন মরাজাতির প্রাণে বান ডাকালেন। মোটরের উপর অধিনায়কোচিত ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান সুভাষ সেদিন নেতাজীর পূর্ব্বপ্রকাশ মাত্র। সেদিনকার সেই শুভ প্রভাতের বিজয়ী বীর সামরিক বাদ্যের তালে তালে এক নিমেষে জয় করেছিলেন জাতীয় নৈরাশ্য ও ভীরুতাকে। সেদিন তাঁর দিব্যশ্রীমণ্ডিত মুখমণ্ডল থেকে কারো দৃষ্টি ফিরতে চাইছিল না। সে দিনের সে স্বপ্ন দীর্ঘ ১৫ বৎসর পরে নেতাজী রূপায়িত করেছিলেন তাঁর আজাদ হিন্দ্ বাহিনীতে।

সুভাষচন্দ্রের পরিচালনায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানও সম্পন্ন হয় অভূতপূর্ব্ব আড়ম্বরের সঙ্গে। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে যৌবনশ্রীমণ্ডিত সুভাষচন্দ্রের প্রভাব সর্ব্বত্র বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

মহাত্মা গান্ধী ডোমিনিয়ন শাসন ব্যবস্থা কংগ্রেসের লক্ষ্য বলে এক প্রস্তাব আনলে সুভাষচন্দ্র তার বিরোধিতা ক'রে এক প্রস্তাব আনেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের লক্ষ্য। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁর এই প্রস্তাব ১৩৫০-৯৭২ ভোটে সেদিন অগ্রাহ্য হয়।

কলকাতা কংগ্রেসের পর সমগ্র ভারতে সুভাষের প্রভাব বিস্তৃত হতে থাকে। এই সময় সারা ভারতে জনগণের মধ্যে একটা প্রবল অসন্তোষের ভাব। বিপ্লবী আন্দোলনও এই সময় মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনের সময় পরিষদকক্ষে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। সর্দ্দার ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত এই ব্যাপারে ধরা পড়েন। দেশের সর্ব্বত্র যুবকদের ধরপাকড় চলতে থাকে। বৎসরের মাঝামাঝি লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হয়। গ্রেপ্তার ও বিচারের সময় ভগৎ সিং ও তাঁর অনুগামীদের নির্ভীক ও তেজস্বী আচরণ জনগণের চিত্ত জয় করে। লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে এই ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীরা দাবী করেন, তাঁরা রাজবন্দী, তাঁদের প্রতি সাধারণ কয়েদীর মত ব্যবহার করা চলবে না। কর্ত্তৃপক্ষ তাতে কান না দেওয়ায় বন্দীরা অনশন ধর্ম্মঘট সুরু করেন। এই অনশনকারীদের মধ্যে ছিলেন বাংলার যুবকর্ম্মী যতীন্দ্রনাথ

দাস। যতীন্দ্রনাথ তখন ২৫ বৎসর বয়স্ক যুবক। সুভাষচন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠন আন্দোলনে যতীন্দ্রনাথ বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন এবং মেজরের মর্য্যাদা লাভ করেন।

এই অনশন নিয়ে সমগ্র দেশে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। আগষ্ট মাসে কলকাতায় নিখিল ভারত লাঞ্ছিত রাজনীতিক দিবস পালিত হয়। দক্ষিণ কলকাতায় এক বিরাট শোভাযাত্রা পরিচালনার জন্য সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতারা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা অনুযায়ী রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন। সংবাদপত্রগুলি তুমুল আন্দোলন চালাতে থাকে। সরকার বন্দীদের দাবী মানতে রাজী হলেন না। দীর্ঘ দিন ধরে অনশন চলতে লাগল। সরকার মেডিক্যাল ভিত্তিতে বন্দীদের প্রতি ভাল ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দিলেন। অনেকে সেই কথায় অনশন পরিহার করলেন। যতীন্দ্র কিন্তু সঙ্কল্পে অবিচল। বন্দীদের সমস্ত দাবী পূরণ না হলে তিনি অনশন ত্যাগ করবেন না। অবশেষে ৬৩ দিন অনশনের পর ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে যতীন মৃত্যুবরণ করেন! মৃত্যুর পর সমগ্র দেশ যেভাবে তাঁকে সম্মান নিবেদন করে, আধুনিক যুগের ইতিহাসে তার তুলনা নাই। বাংলার মাটিতে তাঁর নশ্বরদেহের শেষকৃত্যের জন্য মৃতদেহ আনা হল কলকাতায়। পথিমধ্যে প্রতি ষ্টেশনে হাজারে হাজারে লোক তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করলে। সুভাষচন্দ্র এই শহীদের মৃতদেহ নিয়ে

যে শোকযাত্রা করলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর এত বড় জনযাত্রা আব হয় নি।

এই বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন হল লাহোরে। এবার সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহরু। লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস সেই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করে। কলকাতা কংগ্রেসের বৎসরকাল-মধ্যেই সুভাষ স্বীয় লক্ষ্য জয় করেন। লাহোর কংগ্রেসের পর জনগণের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা। ওয়ার্কিং কমিটি ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা-দিবসরূপে পালন করবার নির্দ্দেশ দিলেন, মহাত্মা গান্ধী রচনা করলেন স্বাধীনতার স্বঙ্কল্পবাক্য। ওয়ার্কিং কমিটি সেই সঙ্কল্পবাক্য অনুমোদন করলেন। ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে এই সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করে জনগণ ঘরে ঘরে উড়ালে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা। সেই থেকে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসরূপে প্রতিপালিত হয়ে এসেছে।

লাহোর কংগ্রেস থেকে প্রত্যাবর্ত্তন করবার পরই ২৩শে জানুয়ারী তারিখে রাজদ্রোহের অভিযোগে তৃতীয় বার তাঁর প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ১৯২৯ সালের লাঞ্ছিত রাজনীতিক দিবস উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা পরিচালনার জন্য তাঁকে নয় মাস সশ্রম কারদণ্ড দেওয়া হয়।

কারারুদ্ধ অবস্থাতেই সুভাষচন্দ্র ১৯৩০ সালের ২২শে আগষ্ট তারিখে কলকাতা কর্পোরেশানের মেয়র নির্ব্বাচিত

হলেন। ২৩শে সেপ্টেম্বর তাঁর কারাবাস শেষ হয়। কিন্তু বেশীদিন তিনি বাইরে থাকতে পারলেন না। ১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা-দিবসে পুলিসের অন্যায় আদেশ উপেক্ষা করে তিনি এক শোভাযাত্রা বের করলে, পুলিস লাঠি চালায়। সুভাষ আহত হলেন। আদালতের বিচারে তাঁর ছয় মাস কারাদণ্ড হয়।

এদিকে লবণ-সত্যাগ্রহকে কেন্দ্র ক'রে সারা ভারতে চলেছে তখন তুমুল আন্দোলন। সরকার চাইলেন গান্ধীজীর সঙ্গে আপোষ করতে। ১৯৩১ সালের ৬ই মার্চ্চ তারিখে গান্ধী-আরুইন চুক্তি সম্পাদিত হল। ৮ই মার্চ্চ সুভাষ কারাবাস থেকে মুক্তি পেলেন। তিনি ও বামপন্থীরা গান্ধী-আরুইন চুক্তি সমর্থন করলেন না। আবার শোনা গেল, সরকার লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সর্দ্দার ভগৎ সিং ও আর দু'জনকে ফাঁসী দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন। সুভাষ গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে সরকারের এই সিদ্ধান্ত বন্ধ করবার জন্য চাপ দিলেন। তিনি গান্ধীজীকে এ কথাও জানিয়ে দিলেন যে, প্রয়োজন হলে এর জন্য গান্ধী-আরুইন চুক্তি ভঙ্গ করা উচিত। মহাত্মা তখন বড়লাটের সঙ্গে আলোচনার জন্য চলেছেন দিল্লী। আলোচনাকালে তিনি বিপ্লবীদের প্রাণরক্ষার আবেদন জানালেন। বড়লাট বললেন, বিষয়টা তিনি বিশেষভাবে বিবেচনা করবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ২৩শে মার্চ্চ সর্দ্দার ভগৎ সিং ও তাঁর সঙ্গীদের ফাঁসী দেওয়া হল। বিদেশী শাসকের

নিষ্ঠুরতায় দেশবাসী বিস্ময়ে হতবাক। দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত শোকের রোল উঠল। এমনি শোকাবহ পরিস্থিতিতে করাচী কংগ্রেসের অধিবেশন হল। এই অধিবেশনে গান্ধী-আরুইন চুক্তি অনুমোদন করা হয়। সুভাষচন্দ্র বাম-পন্থীদের তরফ থেকে এই চুক্তির প্রতিবাদ করলেন। তা সত্ত্বেও কংগ্রেসে যাতে বিভেদসৃষ্টি না হয় তার ব্যবস্থা করে তিনি গভীর রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচয় দিলেন।

এই সময় বাংলাদেশে পুলিসী জুলুম প্রবল হয়ে ওঠে। ১৯৩১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে মেদিনীপুরের হিজলী বন্দীনিবাসে অনুষ্ঠিত হল এক নৃশংস ঘটনা। বন্দীনিবাসে পুলিসের গুলিবর্ষণে বাংলার দুটি বীর সন্তান সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন নিহত হলেন এবং অনেকে আহত হলেন! এই বর্ব্বরতার প্রতিবাদে সুভাষচন্দ্র অল্ডারম্যানের পদে ইস্তফা দিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত পুলিসের এই অত্যাচারে এতদূর বিচলিত হয়েছিলেন যে, কলকাতায় গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের পাদদেশে এক বিরাট জনসভায় তিনি সরকারের এই হৃদয়-হীনতার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে।

ঢাকাতেও জোর চলে পুলিশের অত্যাচার। ঢাকার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টার পর ঘটনার দিন রাত্রিকালেই চার দল পুলিস লেলিয়ে দেওয়া হয়! এরা সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের বাড়ী চড়াও করে। চারদিকে চলে বেপরোয়া ধরপাকড়। এ সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্য

কলকাতা থেকে এক বে-সরকারী তদন্ত কমিটি যায় ঢাকা সহরে। সুভাষচন্দ্র এই কমিটির অন্যতম সদস্য। তাঁরা ঢাকার নিকট উপস্থিত হলে পুলিস অফিসাররা জোর করে তাঁদের ঢাকা জেলা থেকে বের করে দেন। সুভাষ দমবার পাত্র নন। ছাড়া পাওয়া-মাত্র তিনি ঢাকায় যান। তখন তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। কিন্তু পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং তিনি তদন্ত চালান।

এই সমস্ত অত্যাচারে সারা দেশ বিক্ষুব্ধ। আবার মহাত্মা গান্ধী এই সময় গোলটেবিলের ব্যর্থতা নিয়ে ফিরে এলেন বিলাত থেকে। গান্ধী-আরুইন চুক্তির কোন কিছুই সরকার মানলেন না। তাই ১৯৩২ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি পুনর্ব্বার আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

সুভাষচন্দ্রের তীব্র বামপন্থী মনোভাবে সরকার অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। ১৯৩২ সালের ২রা জানুয়ারী তারিখে তাঁকে বোম্বাইয়ের ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী কল্যাণ ষ্টেশনে ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয় এবং মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক রাখা হয়। এই সময় তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। ভারত সরকার তখন যুক্তি দিলেন, বিদেশে চিকিৎসা করাতে যেতে হবে। ১৯৩৩ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে তিনি ইউরোপ যাত্রা করেন। ৮ই মার্চ্চ তারিখে ভিয়েনাতে অবস্থানকালে তিনি ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে "ইণ্ডিয়ান

ষ্ট্রাগল” নামক এক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। ইউরোপের মনীষীরা তাঁর এই গ্রন্থের শতমুখে প্রশংসা করেন। ভিয়েনাতে অবস্থানকালে ভারতের প্রবীণ রাজনীতিক বিঠলভাই প্যাটেল (সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অগ্রজ) বিদেশে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের কথা প্রচারকল্পে তাঁর হাতে এক লক্ষ টাকা উইল করে দেন।

১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্রের পিতা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুভাষচন্দ্র পিতাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হলেন। বহু আবেদন-নিবেদনের পর ভারত সরকার তাঁকে ভারতে আসবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু তিনি আর পিতাকে শেষ-দেখা দেখতে পেলেন না। ৩রা ডিসেম্বর তারিখে বিমানযোগে করাচীতে পৌঁছে তিনি সংবাদ পান যে, আগের দিন তাঁর পিতা দেহ রেখেছেন। শোকসন্তপ্ত হৃদয় নিয়ে তিনি কলকাতায় এলেন। পিতৃশ্রাদ্ধের পর ১৯৩৫ সালের ৮ই জানুয়ারী আবার তাঁকে ফিরে যেতে হল ইউরোপে। এবার অস্ত্রোপচার করে তাঁর স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হয়।

ইউরোপ অবস্থানকালে সুভাষচন্দ্র ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেন। এই সমস্ত দেশেই তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা প্রচার করতে ভোলেন নি। ইউরোপের এই দেশগুলিতে তখন নূতন প্রাণের সাড়া পড়েছে। সুভাষ তাদের এই প্রাণবন্যায় ভারতের মুক্তির স্বপ্ন দেখতে লাগলেন।

১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে তিনি আয়র্ল্যাণ্ডে যান। সেখানে তিনি বর্ত্তমান আয়র্ল্যাণ্ডের স্রষ্টা ডি-ভ্যালেরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ডি-ভ্যালেরার চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সুভাষচন্দ্রের মনে একটা স্থায়ী ছাপ রেখে যায়।

১৯৩৬ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় লক্ষ্ণৌতে। সুভাষচন্দ্র এই অধিবেশনে যোগ দিতে ইচ্ছা করলেন। ভিয়েনার বৃটিশ দূত তাঁকে জানালেন যে, ভারতে ফিরে গেলে ভারত সরকার তাঁকে স্বাধীনভাবে থাকতে দেবে না। সরকারের এই অন্যায় আদেশ অগ্রাহ্য করেই তিনি ভারতে যাত্রা করলেন। ৮ই এপ্রিল জাহাজে ক'রে বোম্বাইতে উপনীত হলে তাঁকে ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে পুনরায় বন্দী করা হয়। মে মাসে তাঁকে কার্সিয়াংএ শরৎচন্দ্র বসুর গৃহে অন্তরীণ করা হয়। ডিসেম্বর মাসে আবার তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়ে। তখন সরকার বিনা সর্ত্তে তাঁকে মুক্তি দেন। সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরকাল বন্দীজীবন যাপনের পর ১৯৩৬ সালের ১৭ই মার্চ্চ তারিখে তিনি কলকাতার বাড়ীতে ফিরে আসেন। পরমপ্রিয় নেতার মুক্তিতে সেদিন সারা ভারত আনন্দমুখর হয়ে উঠে।

শরীর নিয়ে সুভাষচন্দ্রকে এবার বড়ই বিব্রত হতে হয়। পাঞ্জাবের ডালহৌসী শৈলাবাস, কার্সিয়াং করেও বিশেষ উপকার না পেয়ে নভেম্বর মাসে তিনি আবার ইউরোপে গেলেন। অষ্ট্রিয়ার বাদগষ্টিনে প্রায় ছয় সপ্তাহ থেকে তিনি ভাল করে চিকিৎসা করালেন।

১৯৩৮ সালের জানুয়ারীতে তিনি ইংলণ্ডে যান। লণ্ডনে তাঁকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়। ইংলণ্ডে থাকতে-থাকতেই তিনি জাতীয় কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। আজীবন দুঃখনির্য্যাতনের মধ্যে দেশসেবার যে অবিচল নিষ্ঠার পরিচয় তিনি দিয়েছেন, দেশবাসী তার যোগ্য সম্মান দিয়ে তাঁকে শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত করে। ২৪শে জানুয়ারী তারিখে তিনি বিমানযোগে কলকাতায় ফিরে আসেন।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের স্মরণীয় কেন্দ্র বার্দ্দৌলীর নিকটবর্ত্তী হরিপুরায় ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশন বসে। সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে ৫১টি বলীবর্দ্দ-বাহিত রথে কংগ্রেস-নগরে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানাবার জন্য যে শোভাযাত্রা হয়েছিল তা দৈর্ঘ্যে প্রায় চার মাইল। সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র দীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করেন। আড়াই লক্ষ নরনারী উৎকর্ণ হয়ে তাঁর বক্তৃতা শোনে। এই অভি-ভাষণে তিনি দেশে বিভিন্ন সমস্যার নিপুণ আলোচনা করেন।

এতে বহু শিক্ষণীয় বিষয় আছে। বিশ্বের পরিস্থিতি যে ভাবে বিশ্লেষণ করে ১৯৩৮ সালে তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, এখনও তা মনোযোগ দিয়ে পড়লে বিস্মিত হতে হয়।

তাঁর এই অভিভাষণের সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়া গেল :—

"মানবজাতির ইতিহাসে সর্ব্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাম্রাজ্যসমূহের উত্থান ও পতন। প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে ক্রমবর্দ্ধমান

রাষ্ট্রপতি সুভাষ
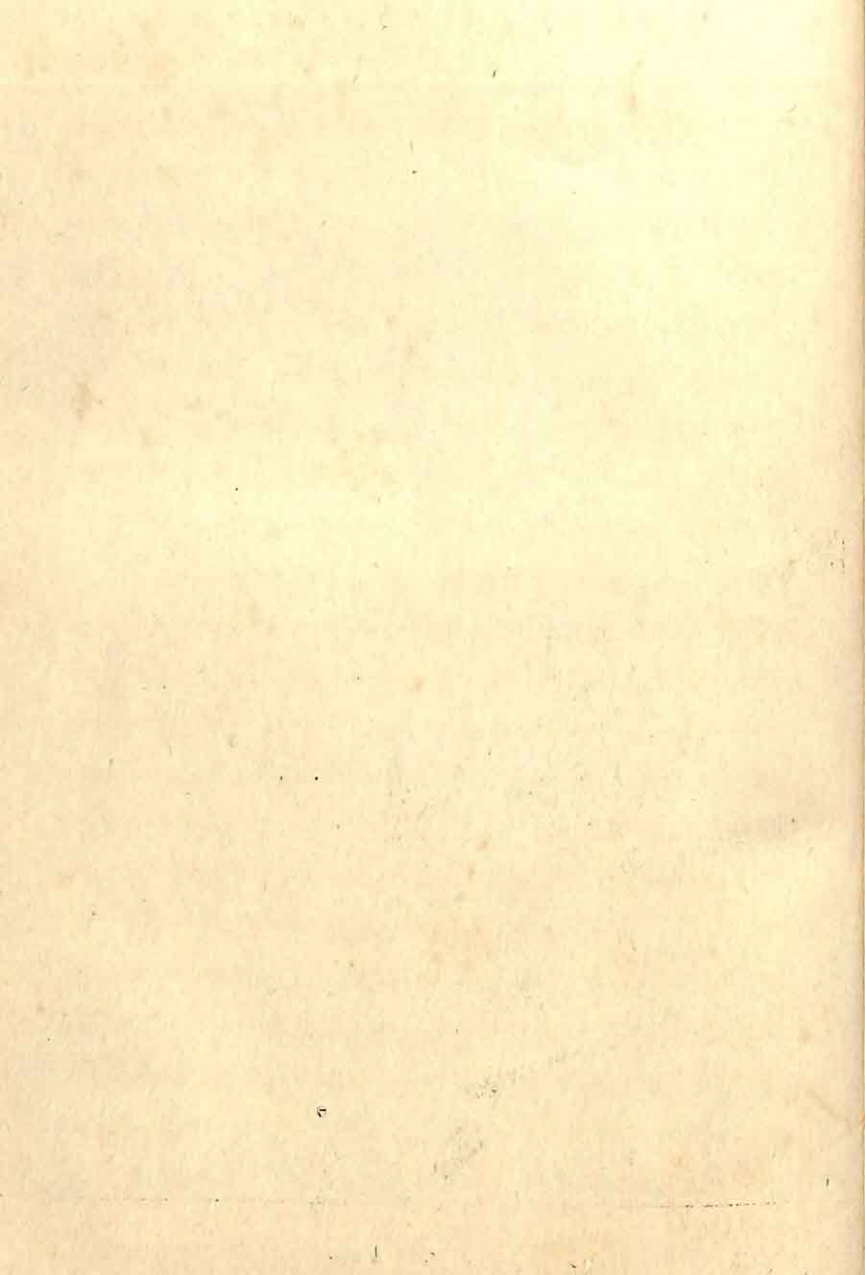
সাম্রাজ্যগুলি একদা উন্নতির চরম শিখরে উঠেছে, আবার ক্রমে ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রাচীন যুগের রোম সাম্রাজ্য এবং বর্ত্তমান যুগের তুর্কী ও অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যগুলি এই বিশ্ব-নীতির উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ভারতের মৌর্য্য, গুপ্ত ও মুঘল সাম্রাজ্যের বেলাতেও এ নীতির কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি। পৃথিবীর ইতিহাসের এই সমস্ত দৃষ্টান্তের পরও কি বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বতন্ত্র পরিণতির কথা কেহ বলতে পারেন? বৃটিশ সাম্রাজ্য আজ ইতিহাসের রাজপথের চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছে। হয় একে অন্যান্য সাম্রাজ্য-সমূহের পথ অনুসরণ করতে হবে, নতুবা স্বাধীন জাতিসমূহের যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হতে হবে। ১৯১৭ সালে জারের সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং ধ্বংসস্তূপ থেকে গড়ে ওঠে সোভিয়েট রাশিয়া। রুশ ইতিহাস থেকে বৃটেনের শিক্ষালাভের এখনও সময় আছে। বৃটেন কি সে সুযোগ গ্রহণ করবে? বৃটিশ সাম্রাজ্য আজ নানাভাবে জর্জ্জরিত। আজ সে সমুদ্রের রাণী বলে গর্ব্ব করতে পারে না। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে নৌশক্তির বলেই বৃটেনের অভ্যুত্থান হয়েছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে বিমানশক্তির অভাবে তার সে প্রাধান্য নষ্ট হয়েছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি আজ যেভাবে টলে উঠেছে, পূর্ব্বে আর কখনও সেরূপ হয় নি।

"বিশ্ব-পরিস্থিতির এই সঙ্কট-মুহূর্ত্তে ভারতবর্ষ আজ নূতন শক্তি সঞ্চয় করেছে। মহাদেশের মত বিশাল আমাদের এই জন্মভূমিতে পঁয়ত্রিশ কোটী লোকের বাস। এতকাল এই

বিপুল জনসংখ্যা ও বিরাট আয়তন আমাদের দুর্ব্বলতার কারণ ছিল। কিন্তু আজ যদি আমরা সম্মিলিত হয়ে শাসক-সম্প্রদায়ের সম্মুখীন হতে পারি তা' হ'লে তাতে আমাদের শক্তিবৃদ্ধিরই প্রমাণ হবে। ভারতের এই ঐক্যের কথা চিন্তার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বৃটিশ-ভারত ও দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে বিভেদের যে সীমারেখা তা' কৃত্রিম। ভারতবর্ষ অখণ্ড এবং বৃটিশ-ভারত ও দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই। অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতালাভই আমাদের সকলের আদর্শ। যে গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহ স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করতে পারে, আমার মতে, তার মধ্য দিয়েই এই স্বাধীনতা লাভ করা যাবে। গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্ত্তনের জন্য দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণ যে আন্দোলন করছেন, কংগ্রেস তা' সমর্থন করে সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছে।

"ভারতের ঐক্যের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়গুলির সমস্যার কথা এসে পড়ে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত প্রস্তাবে তাঁদের নীতি নূতন করে ঘোষণা করেছেন। এই প্রস্তাবে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, লোকের ধর্ম্ম, বিবেক ও সংস্কৃতি বিষয়ক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হবে না এবং সংখ্যাল্প সম্প্রদায়গুলি নিজস্ব নিয়মকানুন অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ভারতের ঐক্যের পরিপন্থী ও জাতীয়তার বিরোধী বলে ঘোষণা

করা সত্ত্বেও কংগ্রেস বলেছেন যে, সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের অভিমত অনুসারেই এর পরিবর্ত্তন করা হবে। পারস্পরিক আপোষ-মীমাংসার দ্বারা এই বাঁটোয়ারা পরিবর্ত্তনের সুযোগ গ্রহণে কংগ্রেস সর্ব্বদা প্রস্তুত। সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের কথা চিন্তা করতে মুসলমানদের কথা বড় হয়ে দেখা দিলেও অন্যান্য সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের জন্যও কংগ্রেস ব্যস্ত। অখণ্ড ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রক্ষার দাবী নিয়েই কংগ্রেস আজ সংগ্রামে রত। ভারতের স্বাধীনতালাভে মুসলমানদের শঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই—বরং লাভবান হবার সুযোগই বেশী।

"এখন আমি কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নীতি ও কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে কিছু বলব। জাতীয় সংগ্রামে অহিংস অসহযোগ অথবা সত্যাগ্রহই হবে কংগ্রেসের কর্ম্মপন্থা। এই অহিংস অসহযোগ কথাটিকে ব্যাপক অর্থে নিতে হবে এবং এর মধ্যে আইন অমান্য আন্দোলনও নিহিত থাকবে। একে কেবলমাত্র নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বলা সঙ্গত হবে না। সত্যাগ্রহ বলতে আমি নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় উভয়বিধ প্রতিরোধ বুঝি। তবে এই সক্রিয় প্রতিরোধ সম্পূর্ণ অহিংস ধরনের হবে। আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমানে দুটি পন্থা বর্ত্তমান। পূর্ণ-স্বাধীনতা অর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালনা এবং সংগ্রামের পথে যে সকল ক্ষমতা আমাদের হাতে আসবে, সেগুলি অস্বীকার করা অথবা পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকালে আমাদের অবস্থিতিকে

দৃঢ় করা—এই দুই পন্থার মধ্যে একটিকে আমাদের বেছে নিতে হবে। নীতির দিক দিয়ে উভয় পন্থাই গ্রহণযোগ্য। তবে আমরা যে পন্থাই গ্রহণ করি না কেন, বৃটিশের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদই আমাদের চরম লক্ষ্য। ভারতে বৃটিশ প্রভুত্ব যখন নিশ্চিহ্ন হবে তখনমাত্র তাদের সঙ্গে আমরা মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারি। আয়ার্ল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতির ন্যায় আমিও বলতে চাই যে, বৃটিশ জনসাধারণের প্রতি আমরা বিন্দুমাত্র বৈর-ভাব পোষণ করি না। আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের পর বৃটিশ জনগণের সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ না হবার কোন কারণই নাই।

"জাতীয় সংগ্রামে কংগ্রেসের স্থান সম্পর্কে অনেকেরই কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। অনেকের এমন ধারণাও আছে যে, স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে এবং তখন আর কংগ্রেসের অস্তিত্বের কোন প্রয়োজন নেই। আমি বলতে চাই যে, স্বাধীনতা লাভের পরও কংগ্রেসের অস্তিত্ব থাকবে এবং তখন কংগ্রেসকে অধিকতর গুরুভার বহন করতে হবে। কংগ্রেসকে তখন পুনর্গঠনমূলক কার্য্যসূচীকে কার্য্যকরী করতে হবে। (প্রথম) মহাসমরের পরবর্ত্তী ইউরোপের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যে-সকল দেশে শক্তিশালী দল পুনর্গঠন কাজে আত্মনিয়োগ করেছে সেই সকল দেশে জাতীয় অগ্রগতি অব্যাহত আছে। ভবিষ্যৎ সমাজগঠন ব্যবস্থার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া এখন সম্ভবপর না হলেও, আমার বিশ্বাস এই যে,

কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারাই দারিদ্রমোচন, নিরক্ষরতা ও ব্যাধি দূরীকরণ সম্ভব এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পারলেই আমাদের প্রধান প্রধান জাতীয় সমস্যার সমাধান হতে পারে। এই পুনর্গঠন কাজের জন্য আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় সরকারকে সর্ব্বাগ্রে একটি কমিশন নিয়োগ করতে হবে।

"জাতীয় ঐক্যবৃদ্ধির নিমিত্ত একটি সাধারণ বর্ণমালা ও রাষ্ট্র-ভাষার প্রবর্ত্তন প্রয়োজন। অতঃপর বিমান, টেলিফোন, বেতার চলচ্চিত্র, টেলিভিসন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন অংশকে একত্র করে একটি সাধারণ শিক্ষানীতির দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় ভাবের প্রবর্ত্তন করতে হবে। সাধারণ বর্ণমালা হিসাবে রোমান বর্ণমালা এবং রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দী ও উর্দ্দুর সংমিশ্রণে গঠিত ভাষা গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত।

"দারিদ্র দূরীকরণই পুনর্গঠন-কাজে আমাদের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। এজন্য ভূমিব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদসাধন প্রয়োজন; কৃষিঋণ মকুব করতে হবে এবং পল্লীবাসীদের অল্প সুদে অর্থসাহায্য করতে হবে। উৎপাদক ও গ্রাহক উভয়ের সুবিধার জন্য সমবায় আন্দোলন প্রসারের চেষ্টা করতে হবে। অধিকতর ফসল উৎপাদনের জন্য বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকার্য্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

"একমাত্র কৃষিব্যবস্থার উন্নতির দ্বারা জাতির অর্থনৈতিক

সমস্যার সমাধান হবে না। এজন্য রাষ্ট্রের অধিকারাধীনে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে শিল্পবাণিজ্যেরও প্রসার প্রয়োজন।

"ভারতের এগারটি প্রদেশের মধ্যে সাতটি প্রদেশ কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছেন। সুতরাং নূতন শাসনতন্ত্রের প্রাদেশিক অংশে বিরোধিতার কোন কথা উঠে না। নূতন শাসনতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্র-পরিকল্পনাকে কিভাবে বাধাদান করতে হবে ভেবে দেখা দরকার। ওয়ার্কিং কমিটি এসম্পর্কে গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন তাতে কংগ্রেসের মনোভাব বর্ণিত হয়েছে। প্রস্তাবটি বর্ত্তমান অধিবেশনে আলোচিত হবে।

"যুক্তরাষ্ট্র-পরিকল্পনার প্রতি বিরুদ্ধভাব পোষণের কারণ সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে, এতে বাণিজ্য ও অর্থবিষয়ক যে সমস্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা আছে তাতে সরকারী ব্যয়ের উপর জনসাধারণের কোন হাতই থাকবে না। তা' ছাড়া দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি নির্দ্ধারণের ব্যাপারেও জনগণ বঞ্চিত থাকবে। প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডল ও প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলের ক্ষমতার তুলনা করা যায় না। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের গঠনও অত্যন্ত প্রগতিবিরোধী। দেশীয় রাজ্যসমূহের লোকসংখ্যা সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যা শতকরা প্রায় ২৪ ভাগ মাত্র। তা' সত্ত্বেও দেশীয় রাজ্যসমূহের নৃপতিগণকে, তাঁদের প্রজাবৃন্দকে নয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার নিম্নতর পরিষদে শতকরা তেত্রিশটি ও উচ্চতর পরিষদে শতকরা চল্লিশটি আসন দেওয়া হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে, যুক্তরাষ্ট্র-পরিকল্পনার প্রতি

কংগ্রেসের মনোভাব কখনও পরিবর্ত্তিত হবার সম্ভাবনা নেই। সরকার যে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা এদেশের কাঁধে চাপিয়ে দিতে চাইছেন, তাতে বাধাদানের সাফল্যের উপরই আমাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সর্ব্বপ্রকার বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। সর্ব্বশেষে আমাদের হয়তো ব্যাপক আইন-অমান্য আন্দোলনের আশ্রয় নিতে হবে। ভবিষ্যতে যদি এইরূপ ব্যাপক আইন-অমান্য আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তা' হলে আন্দোলন কেবল বৃটিশ-ভারতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের মধ্যেও তা' বিস্তৃত হবে।

"গত কয়েক বৎসরের মধ্যে গণজাগরণ এরূপ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, আমাদের দল পরিচালনা সম্পর্কে বহু নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। এখন যে কোন সভা-সমিতিতে পঞ্চাশ হাজার নরনারীর সমাবেশ হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, এইরূপ সভা ও শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। এই বিরাট গণজাগরণকে কেন্দ্রীভূত করে সুনির্দ্দিষ্ট পথে চালিত করবার বৃহত্তর সমস্যাও আছে। এজন্য আমাদের সুসংবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী আছে কি? আধুনিক রাজনৈতিক দলের এই সকল প্রয়োজন মিটাবার এখন সময় এসেছে। সুশিক্ষিত অধিনায়কবৃন্দ-পরিচালিত এক স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী আজ আমদের বিশেষ প্রয়োজন। রাজনৈতিক কর্ম্মীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা হলে

ভবিষ্যতে আমরা যোগ্য রাজনৈতিক নেতা লাভ করব। আমাদের কর্ম্মীদের জন্য বৈজ্ঞানিক ধারায় সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা প্রয়োজন। নাৎসীদের শ্রমিক সেবাবাহিনীর ন্যায় প্রতিষ্ঠান আমাদের অভাব মেটাতে পারে। উপযুক্ত ভাবে সংশোধন ক'রে প্রবর্ত্তন করলে তা' ভারতের পক্ষে কল্যাণকর হবে।

"এখন কংগ্রেসের সহিত ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস ও কিষাণ সভাসমূহের সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত তা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। কেউ বা কংগ্রেসের বহির্ভূত যে কোন প্রতিষ্ঠানের নিন্দা করেন, আবার কেউ বা তাদের আবশ্যকতা স্বীকার করেন। আমার মতে, তাদের অস্তিত্ব আমরা পছন্দ করি বা না করি তাদের সঙ্গে আমাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, তাদের সম্পর্কে কংগ্রেস কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবে? রাজনৈতিক অধিকার লাভের সংগ্রামে কংগ্রেস হচ্ছে জনগণের প্রতিনিধি। সুতরাং কংগ্রেসের বিরোধীদল রূপে এগুলিকে স্বীকার করা যায় না। কাজেই এই সকল প্রতিষ্ঠানকে কংগ্রেসের আদর্শে ও কার্য্যপন্থায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। এইজন্য ট্রেড ইউনিয়ান ও কিষাণসভা-সমূহে দলে দলে কংগ্রেসকর্ম্মীদের যোগদান করা কর্ত্তব্য। ট্রেড ইউনিয়ান ও কিষাণসভাগুলি যদি কংগ্রেসকে দেশের মুক্তিসাধনার সর্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠান রূপে গণ্য করে তা' হলে কংগ্রেস ও উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সহযোগিতা সহজসাধ্য

হতে পারে। কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

"কংগ্রেসের মধ্যে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল গঠনে বহু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের পক্ষে আমি ওকালতি করছি না এবং আমি এর সদস্যও নই। তবে এর সাধারণ নীতির সঙ্গে প্রথম থেকেই আমি একমত। প্রথমতঃ বামপন্থীদের একটি দলে সুসংহত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়তঃ বামপন্থীদলের প্রকৃতি যদি সমাজতন্ত্রমূলক হয়, তা' হলে একটি বামপন্থী ব্লক থাকার সঙ্গত কারণ থাকতে পারে। এইরূপ ব্লককে দল বলা হলে অনেকে আপত্তি করেন, আমি মনে করি এইরূপ পার্থক্য করার কোন মানে হয় না। কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্র অনুযায়ী এরূপ চরমপন্থী বিরোধীদল গঠন কিছুই অন্যায় নয়—একে দল বা লীগ বা ব্লক যে কোনও নামই দেওয়া যেতে পারে। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল বা অনুরূপ দলকে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী বা চরমপন্থীদলের মত কাজ করতে হবে। সমাজতন্ত্র আমাদের আশু সমস্যার বিষয় নয় কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর সমাজতন্ত্রবাদ গ্রহণের জন্য দেশকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রচারকার্য্যের প্রয়োজন। সমাজতন্ত্রবাদে আস্থাবান কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল দ্বারা সেই প্রচারকার্য্য চলতে পারে।

"গত কয়েক বৎসর যাবৎ একটি সমস্যা সম্পর্কে আমি বিশেষ আগ্রহান্বিত। আমি ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ও

আন্তর্জ্জাতিক সংযোগ স্থাপনের কথা বলছি। আমার মনে হয় আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটবে যে, তা ভারতের মুক্তিসংগ্রামে অনুকূল হবে। সেইজন্য বিশ্বপরিস্থিতির প্রতিটি পরিবর্ত্তন সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং কিরূপে তার সুযোগ গ্রহণ করা যায় তা' বিবেচনা করে দেখতে হবে। আমাদের সম্মুখে মিশরের দৃষ্টান্ত রয়েছে। কোন প্রকার হিংসানীতি গ্রহণ না করেই মিশর কিরূপে স্বাধীনতার সন্ধিচুক্তি আদায় করতে সমর্থ হয়েছিল? ভূমধ্যসাগরে ইঙ্গ-ইতালীয় বিরোধের সুযোগ গ্রহণের ফলেই তা' সম্ভব হয়েছিল।

"পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক দেশেই ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল নরনারী থাকবেই। প্রত্যেক দেশেই ভারতের প্রতি সহানু-ভূতিসম্পন্ন নরনারীর দল গঠন করতে হবে। বিদেশে যে সকল ভারতীয় ছাত্র আছে, তারাও আমাদের এই প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে পারে। ভারতীয় ছাত্রদের অভাব-অভিযোগের প্রতি আমরা দৃষ্টি রাখতে পারলে তারাও এবিষয়ে আমাদের সাহায্য করবে। আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে হলে ইউরোপ, এসিয়া ও আমেরিকায় কংগ্রেসের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করতে হবে। প্রত্যেক আন্তর্জ্জাতিক সভা-সম্মেলনে ভারতবর্ষকে যোগ দিতে হবে। এইরূপ সভা-সম্মেলনে যোগদানের ফলে ভারতের প্রয়োজনীয় প্রচারকার্য্যের

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে এবং বিশ্বজনমতের নিকট ভারতের দাবী স্বীকৃত হবে।

"এসিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবাসী ভ্রাতৃবৃন্দের কথা, তাঁদের অভাব-অভিযোগের ও সমস্যার কথা আমরা যেন বিস্মৃত না হই। কংগ্রেস তাঁদের সম্পর্কে সর্ব্বদা গভীর মনোযোগ দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও দিবেন। স্বাধীন ভারত বিশ্বের রাজনীতিক্ষেত্রে বিরাট শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করবে। তখন প্রবাসী ভারতীয়দের স্বার্থ সংরক্ষণে কোন বাধার সৃষ্টি হবে না।

"এখন আমি আটক ও রাজনৈতিক বন্দীদের সমস্যার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্ত্তমানে এটা আমাদের প্রধান সমস্যা। তাঁদের আশুমুক্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমার বিশ্বাস, আমার এই মন্তব্যে কংগ্রেসের মনোভাব ব্যক্ত হবে। যে সকল রাজনৈতিক বন্দী কারাগারের ভিতরে ও বাহিরে অবরুদ্ধ আছেন কেবল তাঁরাই যে দুঃখভোগ করছেন তা নয়, আজ যাঁরা মুক্তি পেয়েছেন তাঁদের অবস্থাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে শোচনীয়। যক্ষ্মার মত নানারূপ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে তাঁরা ঘরে ফিরছেন। তাঁদের সম্মুখে আজ অনাহারের ভয়াবহ সম্ভাবনা। আত্মীয়পরিজনের হাসিমুখে অভ্যর্থনার পরিবর্ত্তে তাঁরা লাভ করেন করুণ অশ্রুর অভিনন্দন। মাতৃভূমির সেবায় জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ উৎসর্গ করে বিনিময়ে যাঁরা দুঃখ ও

দারিদ্র লাভ করেছেন তাঁদের প্রতি কি আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই? অতএব যাঁরা দেশপ্রীতির অপরাধে নির্য্যাতন ভোগ করেছেন, তাঁদের সকলকে যেন আমরা আন্তরিক সহানুভূতি দেখাই এবং দুঃখ-লাঘবের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করি।

"বন্ধুগণ, আর একটা প্রসঙ্গ তুলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। কংগ্রেসই বর্ত্তমানে গণসংগ্রামের সার্ব্বভৌম প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দল থাকতে পারে—কিন্তু ভারতের মুক্তিকামী সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রতিষ্ঠানের মিলনক্ষেত্র কংগ্রেস। অতএব আসুন, কংগ্রেসের পতাকাতলে সমগ্র জাতিকে সমবেত করুন। কংগ্রেসকে শক্তিশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ করুন, বামপন্থীদের প্রতি আমার আবেদন তাই।

"উপসংহারে আমি ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করি যে, জাতির মুক্তির জন্য মহাত্মাজী আরও দীর্ঘকাল জীবিত থাকুন। এই যুগসন্ধিক্ষণে ভারত তাঁকে কিছুতেই হারাতে পারে না। দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ রাখবার জন্য তাঁকে প্রয়োজন, আমাদের সংগ্রামকে হিংসা-দ্বেষমুক্ত করতে তাঁকে প্রয়োজন। ভারতের স্বাধীনতা ও সর্ব্বমানবের কল্যাণের জন্য গান্ধীজীর সাহচর্য্য প্রয়োজন। আমাদের সংগ্রাম বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই নয়, বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম। কেবল ভারতের স্বাধীনতার জন্যই আমরা সংগ্রাম করছি না—সর্ব্বমানবের মুক্তির জন্য সংগ্রাম

করছি। ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে বিশ্বমানবের মুক্তি সমস্যা বিজড়িত।"

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ায় ভারতের প্রতিটি নরনারী আনন্দিত হল। তাঁর পূর্ব্বে এত অল্প বয়সে আর কেউ এই গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেন নি। মহাত্মা গান্ধী তাই কংগ্রেসের তরুণতম সভাপতিকে আখ্যা দিলেন—"রাষ্ট্রপতি"। সেই থেকে কংগ্রেস-সভাপতিকে রাষ্ট্রপতি বলা হয়।

মহামানব রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে রাষ্ট্রপতি সুভাষকে অভিনন্দন জানালেন। তিনি বললেন, "তোমাকে আমি রাষ্ট্র-নেতারূপে স্বীকার করেছি মনে মনে। আমার সঙ্কল্প আছে, জনতার মধ্যে আমার সেই বাণী আমি প্রকাশ করব। তুমি বাংলা-দেশের রাষ্ট্রীয় অধিপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ। অন্য দেশকে আমি জানি না, সেখানে আমার জোর খাটবে না। আমি বাঙালী, বাংলাকে জানি—বাংলার প্রয়োজন অসীম। সেইজন্য তোমাকে যদি আহ্বান করি, স্বীকার করতে হবে।"

শান্তিনিকেতনের ছাত্রেরা এক সভায় সুভাষকে সম্বর্দ্ধনা জানায়। সুভাষ চিরদিন তরুণদলের প্রিয়। তিনি এই সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, "আমরা যে নূতন ভারত তৈরী করব তার প্রতিষ্ঠা হবে মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম আদর্শের উপর। তাকে ভিত্তি করে স্বরাজের সৌধ নির্ম্মিত হবে।

তার মধ্যে জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন ফুটিয়ে তুলতে পারব, ভারতবর্ষকে আবার ধনধান্যে পূর্ণ করতে পারব। যেদিন ভারতের প্রত্যেক নরনারীকে মনুষ্যত্বের উচ্চতর সোপানে উন্নীত করতে পারব, সেদিন আমাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হবে। শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে শিক্ষার যে আয়োজন হয়েছে তার যদি সদ্ব্যবহার হয় তা' হলে জাতি-সংগঠনের কাজ সাফল্যমণ্ডিত হবে।"

হরিপুরা কংগ্রেসের পর সুভাষচন্দ্র অসামান্য সাফল্যের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির কাজ চালাতে লাগলেন। বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে লাগলেন। সংস্কার ও জাতিগঠনের কাজ সুষ্ঠুভাবেই চলতে লাগল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কংগ্রেসের আর-আর নেতাদের সঙ্গে লাগল বিরোধ। সুভাষ চিরকালই চরমপন্থী। পূর্ণ স্বাধীনতা ও জাতির হাতে আসল ক্ষমতা আসা ছাড়া তাঁর মনে শান্তি নেই। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা যুক্তরাষ্ট্র-পরিকল্পনার পক্ষপাতী হয়ে উঠলেন। সুভাষ এটা পছন্দ করলেন না। প্রকাশ্যভাবেই তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা করলেন। সর্দ্দার প্যাটেল প্রভৃতি নেতারা মনে মনে চটে গেলেন। ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচনকে উপলক্ষ করে এই বিরোধ আত্মপ্রকাশ করল। প্যাটেল প্রভৃতি নেতারা চাইলেন ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়াকে কংগ্রেসের সভাপতি করতে। সুভাষচন্দ্র নির্ব্বাচনপ্রার্থী হলেন এবং জয় হল তাঁরই। গান্ধী,

প্যাটেল, জওহরলাল প্রভৃতি প্রধান প্রধান নেতাদের সমর্থন পেয়েও ডাঃ সীতারামিয়া পরাজিত হলেন।

নেতৃবৃন্দ সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচনে সুখী তো হলেনই না, তাঁরা কংগ্রেস-সভাপতিকে সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর মত আক্রমণ করতে লাগলেন বিবৃতির পর বিবৃতি ছেড়ে। সুভাষচন্দ্র শান্ত ও সংযতভাবে সমস্ত বিবৃতি খণ্ডন করলেন তাঁর যুক্তিজাল দিয়ে। এমন সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং প্রবল জ্বর নিয়েই গেলেন ত্রিপুরী কংগ্রেসে। নির্ম্মম রাজনীতির খেলায় মানবধর্ম্ম কোথায় গেল তলিয়ে। সুভাষ-চন্দ্রকে জব্দ করবার অভিলাষে দক্ষিণপন্থীরা পন্থ-প্রস্তাব এনে সভাপতির ক্ষমতা সঙ্কোচ করবার চেষ্টা করলেন।

সুভাষচন্দ্র অসুস্থ শরীর নিয়ে দীর্ঘ ভাষণ দিতে পারেন নি। সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি সর্ব্বপ্রকার ভেদবিসম্বাদ বিসর্জ্জন দিয়ে জাতীয় সংগ্রামে অগ্রসর হবার আবেদন জানালেন। তিনি আসন্ন মহাসমরের সুযোগ নিয়ে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে চরমপত্র দানের প্রস্তাব করেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসে তাঁর এ প্রস্তাব দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দের মনঃপূত হয় নি। কিন্তু ১৯৪২ সালে বোম্বাইতে সেই প্রস্তাবই 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবরূপে উত্থাপিত হয়ে সমগ্র ভারতে এক মহা-বিপ্লবের সৃষ্টি করে।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরেও অবস্থার কোন উন্নতি হল না দেখে সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করলেন।

এই সময় প্রবল উত্তেজনার মুখে তিনি যে ধীরতা, স্থিরতা

ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন তাতে তাঁর প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বহুগুণে বেড়ে যায়।

কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ত্যাগ করে সুভাষ নিজ আদর্শ অনুযায়ী কাজ করবার সুযোগ পেলেন। দেশের বামপন্থী শক্তিকে সংহত করে তিনি 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে এক নূতন দল গড়ে তুললেন। অল্প দিনের মধ্যেই বিভিন্ন প্রদেশে ফরোয়ার্ড ব্লকের শাখা স্থাপিত হল। ১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাসে সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে রামগড়ে আপোষবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এদিকে ইউরোপে দ্বিতীয় মহাসমরের আগুন জ্বলে উঠেছে। সুভাষচন্দ্র দেশবাসীকে এই সুযোগ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালেন। কিন্তু সুপ্ত দেশবাসী সেদিন তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে পারে নি।

১৯৪০ সালে তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য ও কলকাতা কর্পোরেশানের অল্ডারম্যান নির্ব্বাচিত হলেন। ফরোয়ার্ড ব্লক দলের মুখপত্ররূপে তিনি এই সময় 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নাম দিয়ে একখানা ইংরেজি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা মারফৎ তিনি যুদ্ধবিরোধী প্রচার চালাতে লাগলেন। 'হিসাব-নিকাশের দিন' শিরোনামায় তিনি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কঠোর সমালোচনা করে এক প্রবন্ধ লিখলেন। মহম্মদ আলি পার্কেও এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন। এ দুটোই শাসকের চক্ষে অন্যায় ঠেকলো এবং তাঁর বিরুদ্ধে রুজু হল দু-দুটো মামলা।

আদালতে মামলা চলে। দেশের মুক্তিস্বপ্নে আত্মভোলা সুভাষ কাজ করে চলেন এক গভীর নেশায়। একটা বিরাট কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন এই সময়। সেটা হল কলকাতায় একটা কংগ্রেস-ভবন প্রতিষ্ঠা। এই কংগ্রেস-ভবনের স্বপ্ন বহুকাল তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তিনি বলতেন যে, কলকাতায় এমন একটা কংগ্রেস-ভবন হবে যেখানে চলবে জাতিগড়ার কাজ। তরুণদের জন্য সেখানে থাকবে সুবিশাল গ্রন্থশালা, আর থাকবে চিত্তবিনোদনের জন্য রঙ্গালয়, বক্তা তৈরী করবার জন্য থাকবে বক্তৃতামঞ্চ। অনেক চেষ্টায় কর্পোরেশানের কাছ থেকে তিনি এক খণ্ড জমি বন্দোবস্ত করে নিলেন সামান্য খাজনায়। কিন্তু পরিকল্পনামত বাড়ী করতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন সে অর্থ সংগৃহীত হয় নি। অথচ তাঁর আর দেরী সইছিল না। যে অর্থ পাওয়া গেল তাই দিয়েই কাজ আরম্ভ করে দিলেন। ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করলেন রবীন্দ্রনাথ এবং তিনিই এর নাম দিলেন 'মহাজাতিসদন'।

সুভাষচন্দ্র এই সময় আর একটা বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজে হাত দিলেন। তাঁর আহ্বানে বাঙলার তরুণদল কলকাতার বুক থেকে মুছে ফেলে দিল এক কলঙ্কচিহ্ন—সেটা হল 'হলওয়েল মনুমেণ্ট'।

ডালহৌসী স্কোয়ারের উত্তর-পশ্চিম কোণে রাজপথের মধ্যস্থলে এই স্মৃতিস্তম্ভ অবস্থিত ছিল। তোমরা অন্ধকূপহত্যার

কাহিনী শুনেছ নিশ্চয়ই। সেই অলীক কাহিনীকে মর্ম্মরের স্মৃতিস্তম্ভে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন ইংরাজ শাসকের দল। ভারতের ঐতিহাসিকগণ অন্ধকূপহত্যার কাহিনীর অসারতা প্রমাণ করে দেওয়া সত্ত্বেও ভারতবাসীর মুখে কলঙ্ককালি লেপে দেবার হীন চেষ্টায় রচিত মিথ্যা কাহিনীর স্মৃতিস্তম্ভ দাঁড়িয়েছিল কলকাতার বুকে। সুভাষ দাবী করলেন, এই মিথ্যার মর্ম্মরবেদীকে সরিয়ে ফেলতে হবে। শাসকসমাজ টললেন না। চিরতরুণ সুভাষের ডাকে বাঙ্গালার তরুণের দল এল ছুটে। হিন্দু-মুসলমান একযোগে চালালো আন্দোলন। রাজধানীর রাজপথ থেকে ইংরেজ সরকার সরিয়ে নিতে বাধ্য হল সেই মিথ্যার মিনার।

সুভাষচন্দ্র কারারুদ্ধ হলেন। বিদেশী শাসক সুভাষের এতটা বাড়াবাড়ি সইতে পারলেন না। লেখায়, বক্তৃতায়, আন্দোলনে, সর্ব্বত্রই এই লোকটির বৃটিশ-বিদ্বেষ তাঁদের উদ্বেগ সৃষ্টি করল। কারাগারেও শান্তি নেই। অন্যায়ভাবে আটক রাখার প্রতিবাদে তিনি জেলের ভিতরে আরম্ভ করলেন অনশন। সরকার বাধ্য হয়ে তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দিলেন, কিন্তু তাঁকে বন্দী করলেন তাঁর বাড়ীতেই। বাড়ীর চারদিকে কড়া পাহারা বসান হল।

কিন্তু দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচন যিনি জীবনের ব্রত করেছেন তাঁকে কি আটক রাখা সম্ভব? পৃথিবীর কোন শাসক শক্তিই কোনকালে মুক্তিকামী মহামানবকে বেঁধে রাখতে পারে নি।

সহস্র সতর্ক প্রহরীর চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে তাই সুভাষচন্দ্র একদিন বাড়ী থেকে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হলেন।

আলিপুর জেলে থাকতে-থাকতেই সুভাষ হঠাৎ দাড়ি রাখতে আরম্ভ করলেন। বাড়ীতে এসে তিনি যেন একেবারে আত্মস্থ হয়ে গেলেন। লোকের সঙ্গে খুব কমই কথা বলেন। সকলে বলতে লাগল, সুভাষচন্দ্র আবার সেই প্রথম জীবনের মত ধর্ম্মচর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তারপর ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে স্বাধীনতা-দিবসে কলকাতার লোক শুনে বিস্মিত হল যে, সরকারের কড়া পাহারাকে তুচ্ছ করে সুভাষ অন্তর্দ্ধান করেছেন। তাঁর এই আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে দেশবাসী মর্ম্মাহত হল—তাদের প্রিয় নেতা দূরে চলে গেলেন বলে। সরকারী মহলে বিষম চাঞ্চল্য দেখা দিল। বহু চেষ্টাতেও পুলিস ও গোয়েন্দা-বিভাগ তাঁর কোন হদিস করতে পারলে না। গভর্নমেণ্ট তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ক্রোকের নির্দ্দেশ দিলেন।

মুক্তির অদম্য প্রেরণা যখন দেশপ্রেমিককে চঞ্চল করে তোলে, তখন শাসকের শতবন্ধনও তাকে বেঁধে রাখতে পারে না। বৃটিশরাজের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা এবং রক্ষীরাও তাই সুভাষের পথ আটকাতে পারে নি। ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে তাঁর অন্তর্দ্ধানের কাহিনী প্রচারিত হলেও তিনি তার সাতদিন পূর্ব্বেই কলকাতা ছেড়ে যান। ভ্রাতুষ্পুত্র শিশিরকুমার বসু মোটরে করে তাঁকে গোমো ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসেন।

দীর্ঘ চুল ও দাড়িতে তিনি পাঞ্জাবীর ছদ্মবেশ নিয়ে দুর্গম পথে যাত্রা করেন দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের শপথ নিয়ে।

গোমো থেকে পেশোয়ারে গিয়ে তিনি একজন সঙ্গী নিয়ে দুর্গম পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করে কাবুলে পৌছান। কাবুলে তিনি লালা উত্তমচাঁদ নামক এক ভারতীয় ব্যবসায়ীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। কাবুলে এসে প্রথমে তিনি রুশ দূতের সঙ্গে কথা বলে মস্কো যেতে চাইলেন। তাতে ব্যর্থকাম হয়ে ইতালীর দূতের সাহায্যে তিনি মস্কো হয়ে বার্লিনে পৌঁছান।

এই সময়ে বিশ্বরাজনীতির দুইটি বিরাট ঘটনা সুভাষচন্দ্রের কর্ম্মপন্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে। প্রথমতঃ ১৯৪১ সালের ২২শে জুন জার্ম্মানী কর্ত্তৃক রাশিয়া-আক্রমণ। এই আক্রমণের ফলে রুশ-জার্ম্মান মৈত্রী ছিন্ন হয় এবং বৃটেনের সঙ্গে রাশিয়ার মৈত্রী সম্পর্কের সূচনা হয়। সুভাষচন্দ্রকেও ইংরাজদের বিরুদ্ধে রুশিয়ার সাহায্যের আশা ছাড়তে হয়। দ্বিতীয়তঃ ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাপান কর্ত্তৃক অকস্মাৎ প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন ও বৃটিশ এলাকা আক্রমণ। আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে জাপান যেভাবে দ্রুত সাফল্যলাভ করতে থাকে, তাতে বিশ্বের লোকের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, প্রাচ্যভূমিতে জাপানের জয় অনিবার্য্য। জার্ম্মান-আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় রাশিয়াও তখন টলে উঠছে। সুভাষচন্দ্র তাই বৃটিশের বিরুদ্ধে চক্রশক্তির সাহায্যই শ্রেয়ঃ বলে মনে করেন।

১৯৪১ সালের ২৮শে মার্চ্চ তারিখে সুভাষচন্দ্র বার্লিনে উপনীত হন। সামরিক দিক দিয়ে আত্মপ্রস্তুতির জন্য তিনি রণবিজ্ঞান শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করলেন। হিটলার তাঁকে এ বিষয়ে সকল প্রকার সুযোগ দেন। বিভিন্ন রণাঙ্গন পরিদর্শন করে এবং জার্ম্মান সেনাপতিদের কাছে রণনীতির শিক্ষা নিয়ে সুভাষচন্দ্র ইউরোপে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনে মনোনিবেশ করলেন। ১৯৪২ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্য্যন্ত যখন স্বাধীনতা-দিবসের অনুষ্ঠান চলেছে, প্রবাসে বসে সুভাষচন্দ্র তখন 'ফ্রিস্-ইণ্ডিয়েন' বা স্বাধীন-ভারত-বাহিনীর পত্তন করলেন। দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ভের ফলে যে সকল ভারতীয় যুবক জার্ম্মানী ও অষ্ট্রীয়াতে আটক হয়ে পড়েন এবং জার্ম্মানীর হাতে যে সকল ভারতীয় সৈন্য বন্দী হন, তাদের নিয়েই প্রথমতঃ তিনি এই বাহিনী গঠন করেন।

ইউরোপ ও আফ্রিকায় তখন জার্ম্মানীর অভিযান চলেছে অপ্রতিহত গতিতে। বিজয়ী জার্ম্মান বাহিনী মস্কোর দ্বারে সমুপস্থিত। আফ্রিকাতেও রোমেল মিত্র-বাহিনীকে পর্য্যুদস্ত করে চলেছেন। সুভাষচন্দ্র ভাবলেন, চক্রশক্তি হয়ত শীঘ্রই মধ্যপ্রাচ্যের ভিতর দিয়ে ভারতসীমান্তে উপনীত হবে। আর তাঁর সুশিক্ষিত সেনাদল সেই সুযোগে দেশকে স্বাধীন করবার সুযোগে গ্রহণ করবে। প্রায় ১৮ হাজার ভারতীয় সৈন্য স্বাধীন-ভারত-বাহিনীতে যোগ দেয়।

জার্ম্মান সেনানায়কগণ এই সকল সৈন্যকে আধুনিক রণ-কৌশল শিক্ষা দেন এবং হিটলার এই বাহিনীকে জার্ম্মান-বাহিনীর সমান মর্য্যাদা দেন।

জার্ম্মানীর ন্যায় ইতালীতেও একটি আজাদ হিন্দ বাহিনী গড়ে ওঠে। তারা জাতীয় পতাকা উড়িয়ে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে—"আমার দেশের এই ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাকে সাক্ষ্য রেখে আমি এই প্রতিজ্ঞা করছি যে, ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচনের জন্য আমি মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে কায়মনোবাক্যে সংগ্রাম করব।" ইতালীয় সেনাপতিদের সঙ্গে ইতালীর আজাদ হিন্দ সেনানায়কদের মনান্তর ঘটায় তাঁরা আজাদ হিন্দ বাহিনী ভেঙে দেন।

১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি সুভাষচন্দ্র জার্ম্মানী থেকে বেতারে ভারতবাসীর উদ্দেশে বক্তৃতা দেন। তিনি ভারত-বাসীদিগকে ইংরেজের বিরুদ্ধে আপোষহীন, বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বললেন। সুভাষচন্দ্রের প্রচারের ফলে যাতে দেশে কোন গোলমাল না হয়, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। ভারতবাসীদের চিত্ত জয় করবার জন্য তাঁরা স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স্‌কে ভারতে পাঠালেন একটা মামুলী শাসনসংস্কারের ফরমুলা দিয়ে। ভারতের নেতারা যাতে এই ফরমুলা গ্রহণ না করেন, সুভাষচন্দ্র তজ্জন্য প্রচার চালাতে লাগলেন। তিনি মালয় ও ব্রহ্মবাসীদের আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। যা'হোক, ক্রিপ্স্‌সাহেবের দৌত্য সফল হয়

নি। ভারতের নেতৃবৃন্দ যেদিন তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন, স্নুভাষচন্দ্র সেদিন পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।

১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে ভারতে যে গণবিপ্লব স্নুরু হয়, স্নুভাষচন্দ্র তজ্জন্য ভারতের জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বেতারে তিনি আগষ্ট-বিপ্লবের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়াতে এসেও তিনি এই যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং ভারতে কয়েকজন চর পাঠান। কিন্তু ভারতে অবতরণের পূর্ব্বেই তারা ধরা পড়ে। এই ভাবে আগষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টায় তিনি ব্যর্থ হন। তারপর স্নুভাষচন্দ্র দক্ষিণপূর্ব্ব-এসিয়াস্থ ভারতবাসীদের আহ্বানে চলে আসেন মালয়ে। ইউরোপে তখন স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধে রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধের মোড় ফিরে গেছে রাশিয়ার অনুকূলে। তাই ইউরোপ থেকে মধ্য প্রাচ্য হয়ে ভারতসীমান্তে আসবার স্বপ্ন বিসর্জ্জন দিয়ে এলেন তিনি এসিয়ায়।

... ...

১৯৪৩ সালের ২রা জুলাই তারিখে স্নুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে এলেন। যেন নূতন সূর্য্যোদয় হল। সমস্ত মালয় নবারুণের কনক-কিরণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এইখানেই আরম্ভ হয় স্নুভাষচন্দ্রের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও রোমাঞ্চকর অধ্যায়। ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য এইখানে তিনি যে বিরাট আয়োজন করেছিলেন, ইতিহাসে তার জোড়া মিলে না। কি গভীর আত্মবিশ্বাস ও দেশপ্রেম নিয়ে তিনি ভারতের

মুক্তি-সংগ্রামে নেমেছিলেন, তা' ভাবলে অবাক হতে হয়। পরাধীন জাতির সৌভাগ্য এই যে, মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে এমন এক-একজন লোকের আবির্ভাব ঘটে যিনি নিয়ে আসেন অফুরন্ত প্রাণশক্তি: আর সেই শক্তি সঞ্চারিত করেন সমগ্র জাতির হৃদয়ে। সুভাষচন্দ্র ছিলেন সেই শ্রেণীর মানুষ। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অপূর্ব্ব সংগঠনশক্তি দক্ষিণপূর্ব্ব-এসিয়ার মাটিতে গড়ে তুললে এক বিশাল বাহিনী। ব্রহ্ম, মালয়, সিঙ্গাপুর, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, চীন ও জাপানের ভারতবাসীদের সমবেত করলেন তিনি উদাত্ত আহ্বানে। গড়ে উঠল স্বাধীন ভারতীয় বাহিনী, নারী বাহিনী, কিশোর সেনাদল—যেন রূপকথা, যেন স্বপ্ন! হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, পার্শী, বৌদ্ধ যে যেখানে ছিল ছুটে এল এই আত্মভোলা, মুক্তিপাগল লোকটির ডাকে। সমবেত কণ্ঠে তারা তাঁকে জানাল— "নেতাজী, হুকুম করো।" উত্তর এল—"তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা এনে দেবো।"

নেতাজীর এই আহ্বানে তাদের রক্তে লাগল মুক্তির মাতন। দলে দলে এগিয়ে চলল তারা ভারতসীমান্তে আক্রমণ হানতে —'উষার দুয়ারে হানি আঘাত' তারা আনতে ছুটল 'রাঙা প্রভাত'। কণ্ঠে কণ্ঠে সমর-সঙ্গীত ধ্বনিত হল ভৈরব-মন্দ্রে। আকাশ-বাতাস মুখরিত হল—'কদম কদম বঢ়ায়ে যা' গানের সম্মোহন সুরে।

... ...

ভারতের বাইরে থেকে আক্রমণ হেনে দেশকে স্বাধীন করবার প্রয়াস আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংগ্রামের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম রূপায়িত হলেও বহুদিন পূর্ব্বেই ভারতের বিপ্লবী বীরগণ এমনি পরিকল্পনা করেছিলেন। প্রথম মহাসমরের যুগে ভারতব্যাপী যে একটা সন্ত্রাসবাদের ঢেউ দেখা গিয়েছিল তার পেছনেও এইরূপ আদর্শ ছিল। এই সকল বিপ্লবী মনে করতেন যে, কোন বিদেশী রাষ্ট্রের কাছ থেকে অস্ত্রসাহায্য পেলে ভারতের বিপুল জনসংখ্যার পক্ষে মুষ্টিমেয় ইংরাজদের বিতাড়িত করা এমন কিছু শক্ত নয়। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা অস্ত্রবলে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের এই সকল বিক্ষিপ্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয় এবং বহু বিপ্লবীকে এর মূল্যস্বরূপ ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিতে হয়। আবার অনেকে বিদেশী শাসনদণ্ড এড়াবার জন্য বিদেশে চলে যান। বিদেশে গিয়েও তাঁরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেন নি। চাকুরী বা নানা সূত্রে প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে তাঁরা ভারতের স্বাধীনতার সমর্থনে আন্দোলন চালাতে লাগলেন। চীন, জাপান ও প্রশান্ত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জসমূহে প্রবাসী ভারতীয়দের সংখ্যা খুব বেশী। সেইজন্য এই অঞ্চলেই আন্দোলন বেশ জমে ওঠে এবং রাসবিহারী বসু ও রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ এই দুই প্রতিভাশালী বিপ্লবীর নেতৃত্বে আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি হয়।

পূর্ব্ব-এসিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রধান

উদ্যোক্তা হলেন রাসবিহারী বসু। এই বিপ্লবী বীর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারত ত্যাগ করে জাপানে বসবাস করেন এবং পূর্ব্ব-এশিয়াতে ভারতীয় আন্দোলনে প্রাণসঞ্চার করেন। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চরম বিপ্লববাদীরূপে ইনি আবির্ভূত হন ১৯১২ সালে। সে বছর নয়াদিল্লী হল ভারতের নূতন রাজধানী। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে নূতন রাজধানীতে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন, এমন সময় সেই শোভাযাত্রায় বোমা পড়ল—কয়েকজন লোক মারা গেল, বড়লাট বেঁচে গেলেন। এর পর ভারতের আরও কয়েক স্থানে বোমা পড়ল, সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে সৃষ্টি হল একটা আতঙ্ক : এই সমস্ত ব্যাপারেই রাসবিহারী বসু জড়িত বলে সন্দেহ করা হয়। ১৯১৩ সালে রাজাবাজারে বোমার আখড়া আবিষ্কৃত হলে কাগজপত্রে দেখা গেল যে, ওটা রাসবিহারী বসুর দলেরই একটা আস্তানা। ১৯১৪ সালে সরকার দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা আবিষ্কার করলেন। রাসবিহারী বসুর কয়েকজন সহকর্ম্মী ধরা পড়লেন এবং অনেকের ফাঁসি হল। তাঁকে ধরবার জন্য সরকার ১২ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করলেন ও চারিদিকে তাঁর ছবি প্রচার করলেন। রাসবিহারী সরকারের এই সমস্ত চেষ্টাকে উপেক্ষা করে বাংলা ও পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের মধ্যে মিলনচেষ্টা সাধনে উদ্যোগী হলেন। এই সময় তিনি সদ্য আমেরিকা-প্রত্যাগত এক যুবকের সাহায্যলাভ করেন। এই যুবকটির নাম বিষ্ণুগণেশ

পিংলে। আমেরিকার গদর ও অন্যান্য বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সহযোগ ছিল। রাসবিহারী বসু, পিংলে, মোহন সিং, কর্ত্তার সিং, শচীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিপ্লবীরা ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টির আয়োজন করতে লাগলেন। কোন কোন স্থানে সিপাহীরা রাজীও হল। এমন সময় তাঁদের দলের কোন লোক পুলিসের কাছে সমস্ত ফাঁস করে দেয়। মীরাটের এক সৈন্যশিবিরে পিংলে ধরা পড়লেন এবং তাঁর ফাঁসি হল। রাসবিহারী কিন্তু ধরা পড়লেন না, পুলিসের সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ করে ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি জাপানে পাড়ি মারলেন। তাঁর জাপানে পৌঁছানর মাসখানেক পরে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট খোঁজ পেয়ে জাপ সরকারকে অনুরোধ জানালেন রাসবিহারী বসুকে ভারতে পাঠিয়ে দেবার জন্য। জাপ সরকারও তাতে রাজী হল। রাসবিহারী তখন জাপানের এক মন্ত্রিকন্যার সহায়তায় আত্মগোপন করে থাকলেন। তারপর জাপানের ব্ল্যাক ড্র্যাগন সোসাইটীর সাহায্যে তিনি জাপ নাগরিক অধিকার পেলেন।

জাপানে এসে রাসবিহারী সেখানকার বিপ্লবী ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ করলেন। তারপর চীনদেশস্থ জার্ম্মান দূতের সাহায্যে ভারতে অস্ত্র প্রেরণের আয়োজন করলেন। একজন চীনার হাত দিয়ে তিনি বহু পিস্তল ও টোটা ভারতের বিপ্লবীদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। বৃটিশ পুলিস টের পেয়ে সেগুলো হস্তগত করে। জাপ সরকার বৃটিশ কর্ত্তাদের অনুরোধে পাঁচ

দিনের মধ্যে তাঁকে সাংহাই থেকে চলে যেতে বলেন। রাসবিহারী তখন অর্দ্ধ বৎসরকাল আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য হন।

তারপর রাসবিহারীকে দেখা যায় "ভারত স্বাধীনতা লীগ" গঠন করে ভারতের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চালাতে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি জাপ ভাষায় একখানা পুস্তক প্রণয়ন করেছেন এবং মার্কিন লেখক ডাঃ সাণ্ডারল্যাণ্ডের 'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ' পুস্তক জাপ ভাষায় অনুবাদও করেছেন। জাপ ভাষাতে তিনি সংবাদপত্র প্রকাশ এবং পরিচালনাও করতেন।

১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সিঙ্গাপুরের পতনের পর মালয়ের প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে জাপ সহযোগিতায় যে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয় রাসবিহারী বসুই ছিলেন তার প্রথম নেতা। ১৯৪৩ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে ইনি সুভাষচন্দ্রের হাতে সমস্ত ভার সমর্পণ করেন। আজাদ হিন্দ সরকারে তিনি মন্ত্রিসভার সর্ব্বোচ্চ পরামর্শদাতা ছিলেন। ১৯৪৫ সালের শেষ ভাগে তাঁর মৃত্যু হয়।

এই সময় পূর্ব্ব-এসিয়ায় ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের দ্রুত প্রসারে আর এক বিপ্লবী বীরের অবদান প্রভূত। ইনি রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ। পরাধীনতার বেদনা ইনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিলেন। তাই প্রথম মহাযুদ্ধের সুযোগে

বিদেশের সহায়তা লাভের প্রত্যাশায় ইনি ভারত ত্যাগ করেন।

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ মুরসানের রাজার ছেলে। শৈশবেই হাথরাসরাজ তাঁকে দত্তকপুত্র নেন। হাথরাসরাজের মৃত্যু হলে রাজ্য কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে যায়,—মহেন্দ্রপ্রতাপের বয়স তখন দশ বৎসর। ইনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং কলেজে পড়বার সময় দল পাকিয়ে নেতৃত্ব করতেন। আলিগড় কলেজে বি-এ পড়বার সময় ইংরেজ অধ্যক্ষের আচরণের বিরুদ্ধে ছাত্র-ধর্ম্মঘটে ইনি নেতৃত্ব করেন। এই ব্যাপারের পর তিনি কলেজ ছেড়ে দেন। ঝিন্দের রাজকন্যা শ্রীমতী প্রেমমহাকে ইনি বিবাহ করেন এবং সস্ত্রীক ইউরোপ-ভ্রমণে যান। সেখানকার শিক্ষাপদ্ধতিতে মুগ্ধ হয়ে দেশে এসে ইনি সেই আদর্শে স্থাপন করলেন বৃন্দাবন প্রেমমহাবিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়ে তিনি জাতি সংগঠনের কাজ চালাতে থাকেন। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলে মহেন্দ্রপ্রতাপ জার্ম্মানীতে গিয়ে সম্রাট কাইজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর একখানা পত্র নিয়ে তুরস্কের মধ্য দিয়ে যান আফগানিস্তানে। আফগানিস্তানের সিংহাসনে তখন আমীর আমানুল্লা। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে মহেন্দ্রপ্রতাপ আবার জার্ম্মানীতে ফিরে যান। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে বৃটিশ সরকার তাঁর ভারতে আগমন নিষিদ্ধ করলেন। বাধ্য হয়ে মহেন্দ্রপ্রতাপকে নির্ব্বাসনদণ্ড বরণ করে নিতে হল। জার্ম্মানীতে অবস্থানের সময়

তিনি "ওয়ার্লড ফেডারেশান" নামে একখানা ইংরেজি কাগজ সম্পাদনা করতেন। ভারতের বিভিন্ন পত্রিকাতেও তিনি প্রবন্ধ লিখতেন। জার্ম্মানী থেকে তিনি আফগানিস্তানে যান। সেখানে আমীর আমনুল্লা তাঁকে কাবুলের নাগরিক অধিকার প্রদান করেন। আমীর আমানুল্লার তিনি খুব প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন এবং তাঁর এজেন্টরূপে পৃথিবীতে বহু দেশ পর্য্যটন করেন।

মাঝখানে কিছুদিন তাঁর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। তারপর জানা যায় যে, তিনি জাপানে আছেন। জাপানে বৃটিশ দূতেরা তাঁর উপর নজর রাখতে আরম্ভ করলে তিনি বেশ কড়া ভাবেই জানিয়ে দেন যে, তিনি আফগানিস্তানের প্রজা। তাঁর উপর বৃটিশরাজের কোন খবরদারি করা চলবে না। এর পর তিনি হনলুলুতে হেড কোয়ার্টার করে বিশ্বরাষ্ট্র-সমবায় গঠনের কাজে লাগেন। এই সম্পর্কে তিনি নানা পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। আর্য্যবাহিনী নামক এক স্বেচ্ছা-বাহিনীও তিনি গঠন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করার অধিকতর সুযোগ পেয়ে তিনি জোর প্রচারকার্য্য চালাতে থাকেন। জাপানের পরাজয়ের পর রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ মিত্রশক্তির হাতে যুদ্ধবন্দী হন। ভারতের জনসাধারণ তখন তাঁর মুক্তির জন্য প্রবল আন্দোলন চালাতে থাকে। বহু আবেদন-নিবেদন করা হয়। তার ফলে মিত্রপক্ষ তাঁকে মুক্তি দেন। ১৯৪৬ সালে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এইভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকেই রাসবিহারী বসু ও রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের মত প্রতিভাবান দুই বিপ্লবীর প্রচারের ফলে পূর্ব্ব-এসিয়ায় ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন পুষ্টিলাভ করে। তাঁরা উভয়েই এই অঞ্চলের দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে, জনসভায় বক্তৃতা করে, এবং জাপ কর্ত্তৃপক্ষমহলে ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করে ভারতের স্বাধীনতার কথা বিশ্বের দরবারে পৌঁছিয়ে দিতে থাকেন। নবজাগ্রত জাপান ইঙ্গ-মার্কিন প্রভাববিরোধী প্রচাররূপে গণ্য করে এ বিষয়ে খুব সাহায্য করতে থাকে। জাপানের অবশ্য ভারতের স্বাধীনতার জন্য মাথা ঘামানোর প্রয়োজন ছিল না, নিজ প্রয়োজনে এবং স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই সে সাহায্যের হস্ত প্রসারণ করে। যাই হোক, জাপ সাহায্যের ফলেই যে পূর্ব্ব-এসিয়ায় ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে প্রাণসঞ্চার হয় তাতে কোন সন্দেহ নাই।

রাসবিহারী বসু ও রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের পর আরও কয়েক-জন দেশপ্রেমিক পূর্ব্ব-এসিয়ায় ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের মধ্যে আনন্দমোহন সহায় ও স্বামী সত্যানন্দ পুরীর নাম উল্লেখ-যোগ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছুকাল পূর্ব্বে এঁরা ভারতের স্বাধীনতার কথা প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বিদেশে প্রচারকার্য্য চালাবার

জন্য যে পরিকল্পনা করেছিলেন তার ফলে জাপানের কোবে বন্দরে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল এসোসিয়েশান' নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় এবং তার কাজ চালাবার জন্য সেখানে আনন্দমোহন সহায়কে পাঠান হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত এঁর বিবাহ হয়। কিছুকাল ইনি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ করেন। আনন্দমোহন সপরিবারে কোবেতে যান এবং চীন, জাপান, শ্যামে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে আন্দোলন চালাতে থাকেন। এজন্য তিনি "ভয়েস অব ইণ্ডিয়া" নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ এবং নানা পুস্তিকা ও প্রচারপত্র বিলি করেন। কোবের সাংহাই বন্দরেও ইনি 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল এসোসিয়েশান' নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠন করে চীনের নানকিং, মাঞ্চুরিয়া, ক্যাণ্টন প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণ ও প্রচারমূলক বক্তৃতা করতে থাকেন।

দ্বিতীয় মহাসমরের সময় প্রাচ্যে যখন জাপানের বিজয়-অভিযান সুরু হয় ইনি সেই সময় সাংহাইতে ভারতীয়দের এক সভা আহ্বান করেন—১৯৪২ সালের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা-দিবসে। এই সভাতে প্রধানতঃ আনন্দমোহন ও রাসবিহারী বসুর চেষ্টায় পূর্ব্ব-এসিয়ার সমস্ত ভারতীয় প্রতিষ্ঠান মিলিত করে 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ' গঠিত হয়। যে ব্যাঙ্কক-সম্মেলনে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ গঠিত হয়, আনন্দমোহন তাতেও যোগ দেন। তারপর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যখন আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের ভার গ্রহণ করে আজাদ হিন্দ সরকার

গঠন করেন, আনন্দমোহন সহায় তখন আজাদী মন্ত্রিসভার প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হন।

জাপানের আত্মসমর্পণের পর বহুকাল তাঁর কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায় নি। পরে জানা যায় যে, তিনি হ্যানয়ে বৃটিশ সামরিক বিভাগের হাতে বন্দী হন। সেখান থেকে সিঙ্গাপুর জেলে তাঁকে আটক রাখা হয়। প্রবল আন্দোলনের পর ১৯৪৬ সালের জুন মাসে মুক্তি পেয়ে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আনন্দমোহনের ন্যায় স্বামী সত্যানন্দও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রচার-বিভাগের ভার নিয়ে শ্যামে বসবাস করতে থাকেন। তিনি শ্যাম, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশে ভারতীয়দের মধ্যে প্রচার চালাতে থাকেন। সিঙ্গাপুরের পতনের পর রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে টোকিওতে ভারতীয়দের যে সম্মেলন হয়, শ্যামের প্রতিনিধিরূপে সত্যানন্দ তাতে যোগদানের উদ্দেশ্যে বিমানে টোকিও রওনা হন। পথিমধ্যে দুর্ঘটনা ঘটায় তাঁর মৃত্যু হয়।

এই সকল মনীষীর প্রচারের ফলে পূর্ব্ব-এসিয়ার প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে একটা প্রবল বৃটিশবিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে এবং স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য মনে মনে তারা বদ্ধপরিকর হয়। তাদের এই মনোভাব ঘোর বৃটিশবিদ্বেষে পরিণতি লাভ করে—জাপ আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় ইংরেজ শাসকগোষ্ঠি যখন তাদের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে আত্ম-

রক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। এরই ফলে তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বৃটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে।

দ্বিতীয় মহাসমরের সূচনায় তাঁরা তাঁদের স্বপ্নকে রূপায়িত করবার একটা সুবর্ণসুযোগ পেলেন। এ সুযোগ এল মহাবল বৃটিশরাজের শোচনীয় পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর দিনটিকে ইংরেজ কোনদিন ভুলতে পারবে না। মিত্রপক্ষের অপ্রস্তুতির সুযোগ নিয়ে জাপান হানলে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে আকস্মিক আঘাত। মিত্রশক্তির অধিকৃত দ্বীপগুলি অনায়াসে জাপান করায়ত্ত করলে। জাপান সেদিন বিশ্বের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল।

১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বৃটিশের তথাকথিত দুর্ভেদ্য সিঙ্গাপুরের পতন হল। বৃটেনের সামরিক বাহিনী এই সময় শোচনীয় পশ্চাদপসরণ-রণনীতি অবলম্বন করে। উভরড়ে পলায়ন করতে থাকে তারা। কে মরল বা কে বাঁচল তা' দেখবার প্রয়োজনও সেদিন বৃটিশ কর্ত্তারা বোধ করেন নি। মালয়ের ত্রিশ লক্ষাধিক ভারতীয়কে তাদের ভাগ্যের উপরে ছেড়ে দিয়ে বৃটিশ সমরনায়কগণ পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালেন।

এর ফলে সর্ব্বত্র ভারতীয়দের মনে প্রবল আতঙ্কের সঞ্চার হল, সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হতে থাকল। মালয়ের ভারতীয়দের সে কি দুর্দ্দশার দিন! তাদের ধনপ্রাণ রক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। চারদিকে লুঠতরাজ, সকলেই সর্ব্বহারা। বর্ম্মার ভারতীয়দের অধিকাংশই তখন দেশে ফিরবার

চেষ্টায় রত। প্রবাসের সমস্ত-কিছু বিসর্জ্জন দিয়ে তারা দেশে ফিরতে উদ্যত। তার মধ্যে বাঙালী ও মাদ্রাজীর সংখ্যাই বেশী। পথে-প্রান্তরে কত লোক যে সেদিন প্রাণ হারাল তার সংবাদ কে রাখে!

ভারতীয়গণ যে ইংরেজদের উপর সন্তুষ্ট নয়, ভারত থেকে যে তারা ইংরেজদের বিতাড়িত করতে চায়, জাপানীরা তা' জানত। ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গেও তাদের বিশেষ পরিচয় ছিল। তা'ছাড়া তারা "এসিয়া কেবল এসিয়া-বাসীদের জন্য" এই রব তুলে বিজিত দেশের অধিবাসীদের মনোজয়ের চেষ্টা করে। মালয়ে ভারতীয়দের দুরবস্থা দেখে তারা তাদের নিজের কাজে লাগাবার মতলবে উদার ব্যবহারের নীতি অবলম্বন করলে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরে ইংরেজরা আত্মসমর্পণ করে। ১৭ই ফেব্রুয়ারী ভারতীয় যুদ্ধবন্দী সৈন্যদের ফেরার পার্কে সমবেত করা হল। বৃটিশ সেনানী কর্নেল হাণ্ট তাদের জাপ সামরিক প্রতিনিধি মেজর ফুজিয়ারার হাতে সমর্পণ করলেন। মেজর ফুজিয়ারা ঘোষণা করলেন, "জাপান পূর্ব্ব-এসিয়ার সমস্ত জাতির স্বাধীনতার পক্ষপাতী। পূর্ব্ব-এসিয়াকে নিরাপদ রাখতে হলে ভারতের স্বাধীন হওয়া দরকার। জাপ গভর্নমেণ্ট ভারতের স্বাধীনতার সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত। আপনারা ভারতবাসী, দেশকে স্বাধীন করবার চেষ্টা করা আপনাদেরই কর্ত্তব্য। আমি আপনাদের ক্যাপ্টেন মোহন সিংএর হাতে সমর্পণ করছি। তিনিই

আপনাদের নেতা। এখন থেকে আপনারা তাঁরই নির্দ্দেশ মেনে চলবেন।”

ক্যাপ্টেন মোহন সিং জাপানীদের এই সহায়তার সম্পূর্ণ সুযোগ নিলেন। তিনি বললেন, “ভারতকে স্বাধীন করবার একটা মস্ত সুযোগ আমরা পাচ্ছি। আমরা একটি ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠন করে এই কাজে আত্মনিয়োগ করব।”

এর প্রায় তিন সপ্তাহ পর ৯ই মার্চ্চ ও ১০ই মার্চ্চ মালয়ের বিভিন্ন স্থান থেকে ভারতীয় প্রতিনিধিরা সিঙ্গাপুরে এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে জাপানের সহযোগিতার প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। টোকিও থেকে রাসবিহারী বসু সংবাদ পাঠালেন যে, টোকিওতে ভারতীয়দের একটা সম্মেলন করে তাতে চরম সিদ্ধান্ত নেওয়াই ভাল। সিঙ্গাপুর সম্মেলনও সেই প্রস্তাব মেনে নেয় এবং তদনুযায়ী ২৮শে থেকে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত টোকিওতে এসিয়ার বিভিন্ন দেশের ভারতীয়দের এক সম্মেলন হয়। রাসবিহারী বসু এতে সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে স্থির হয় যে, পূর্ব্ব-এসিয়ায় পূর্ণোদ্যমে স্বাধীনতা-আন্দোলন চালাবার জন্য ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ গঠন করা হোক এবং সামরিক প্রস্তুতির জন্য গঠন করা হোক স্বাধীন-ভারত-বাহিনী বা আজাদ হিন্দ ফৌজ। ঘোষণা করা হল যে, এই আন্দোলনে কোন বিদেশী শক্তিরই হাত থাকবে না। কেবলমাত্র ভারতীয়দের নিয়েই স্বাধীন ভারত-বাহিনী গঠিত হবে। ভারতীয় সেনানীরাই করবে তার পরিচালনা, আর

ভারত-অধিকারের অভিযান করবে তারাই। ভারতীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার জন্য শ্যামের রাজধানী ব্যাঙ্ককে দক্ষিণপূর্ব্ব-এসিয়ার সমস্ত ভারতীয়দের প্রতিনিধি নিয়ে আর এক সম্মেলন ডাকা হয়। ১৯৪২ সালের ১৫ই জুন এই সম্মেলন বসে। চীন, জাপান, ফিলিপাইন, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্নিও, ইন্দোচীন, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশ থেকে শতাধিক প্রতিনিধি এতে যোগ দেন। সভাপতিত্ব করেন রাসবিহারী বসু। ন' দিন ধরে চলে এই সম্মেলন। এই সম্মেলনে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ গঠিত হল ব্যাঙ্কক সম্মেলন থেকেই। সভাপতি হলেন রাসবিহারী বসু, সামরিক সদস্য হলেন কর্নেল মোহন সিং, কর্নেল গিলানি ও কর্নেল জগন্নাথ রাও ভোঁসলা। অসামরিক সদস্য হলেন মিঃ মেনন, মিঃ রাঘবন ও মিঃ গুহ। ক্যাপ্টেন মোহন সিংএর উপরই জাতীয় বাহিনী গঠনের ভার পড়ল। তিনিই হলেন বাহিনীর প্রথম অধিনায়ক। হাতের কাছেই যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্য ছিল। তাদের নিয়েই আরম্ভ হল কাজ। দেখতে দেখতে বহু আসামরিক ভারতীয়ও সেনাদলে যোগ দিলেন। এইভাবেই দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ায় প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে ওঠে।

প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজের কাজ বেশী দূরে এগোতে না এগোতে জাপ-সামরিক কর্ত্তাদের হস্তক্ষেপের ফলে ক্যাপ্টেন মোহন সিংএর সঙ্গে তীব্র মতভেদ হয়। জাপানীরা মোহন

সিংকে গ্রেপ্তার করে। ফলে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হয়। রাসবিহারী জাপান থেকে ছুটে আসেন। তিনি জাপ সেনানায়কদের সঙ্গে দীর্ঘ পরামর্শ করে আজাদ হিন্দ ফৌজকে নূতন করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পূর্ব্বের মত আর উৎসাহ দেখা গেল না। ভারতীয়গণ জাপানীদের মনোভাব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠল।

১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসের শেষাশেষি সিঙ্গাপুরে পূর্ব্ব-এসিয়ার ভারতীয় প্রতিনিধিদের আর একটা সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে রাসবিহারী বসুর বিরুদ্ধেও একটা চাপা অসন্তোষ দেখা যায়। তিনি বুঝলেন যে, এদের একত্রে বেঁধে রাখতে হলে একমাত্র সম্মোহন মন্ত্র হচ্ছে সুভাষচন্দ্রের নাম। এই সভায় তিনি ঘোষণা করেন যে, সুভাষচন্দ্র শীঘ্রই সিঙ্গাপুরে আসবেন এবং তিনি এলে সমস্ত ভার তাঁর হাতেই দেওয়া হবে। এ সংবাদে সকলেই উল্লসিত হলেন।

ভারত-ত্যাগের মত সুভাষচন্দ্রের ইউরোপ-ত্যাগও একটা রোমাঞ্চকর ঘটনা। অতলান্তিক মহাসাগরের আকাশে ও জলে তখন মিত্রপক্ষের আধিপত্য। চক্রশক্তি তখন বিমানশক্তিতে হটে এসেছে। এমনই এক দিনে মালয়ের উদ্দেশ্যে সুভাষচন্দ্র সাবমেরিনযোগে পাড়ি দিলেন। অতলান্তিকের এক স্থানে সাবমেরিনটি ভুলক্রমে জলের উপর ভেসে ওঠে। মিত্রপক্ষের বিমানগুলি তখন পিছু নেয়। আত্মরক্ষা করতে করতে সাবমেরিনটি কোনক্রমে সুমাত্রার পেনাং বন্দরে উপস্থিত হয়।

নেতাজী সেখান থেকে বিমানযোগে টোকিও পৌঁছান ২০শে জুন। টোকিওতে জাপ প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো ও রাসবিহারী বসুর সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি সিঙ্গাপুরে যান ২রা জুলাই তারিখে।

সুভাষচন্দ্রের সিঙ্গাপুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের মধ্যে যেন প্রাণসঞ্চার হল। সকলেরই মধ্যে একটা আশার ভাব, সমগ্র মালয় যেন নূতন সূর্য্যের আলোকে দীপ্ত হয়ে উঠল। ৪ঠা জুলাই ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের এক সভা হল সিঙ্গাপুরে। এই সভায় রাসবিহারী বসু সঙ্ঘের সভাপতিপদ ত্যাগ করলেন। সঙ্ঘের সভাপতিপদ গ্রহণ করলেন সুভাষচন্দ্র। পরদিন আজাদ হিন্দ ফৌজের এক বিরাট সমাবেশে তিনি স্বাধীনভারত-বাহিনীকে নবভাবে সংগঠনের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি এই সভায় বলেন—"ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের বীর সৈনিকগণ, আজ আমার জীবনের সবচেয়ে গৌরবের দিন। ভগবান্ আজ আমাকে বিশ্বের সমক্ষে ভারতের মুক্তিবাহিনী গঠনের কথা ঘোষণা করবার সুযোগ দিয়েছেন। যে সিঙ্গাপুর ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটা প্রধান দুর্গ, সেই সিঙ্গাপুরের বুকের উপর রণসজ্জায় দাঁড়িয়ে আছে ভারতের মুক্তিসেনা। এই সেনাদলই ভারতকে বৃটিশ-শাসন থেকে মুক্ত করবে। বন্ধুগণ, তোমাদের রণহুঙ্কার হোক—'চল দিল্লী, দিল্লী চল।' জানি না যুদ্ধশেষে তোমাদের মধ্যে কতজন বেঁচে থাকবে। তবে একথা ঠিক, যুদ্ধে জয় হবে আমাদেরই। দিল্লীর লালকেল্লায় বিজয়ী বীরের

বেশে প্রবেশ না করা পর্য্যন্ত তোমাদের কাজ শেষ হবে না। সুখে দুঃখে, সুদিনে দুর্দ্দিনে, জয়ে পরাজয়ে সর্ব্বদা আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকব।"

এর পর থেকে স্বাধীনতা সঙ্ঘের কাজ চলতে থাকে বেশ ভাল ভাবেই। ফৌজ গঠনও চলে দ্রুততালে। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান সকলেই দলে দলে যোগ দিতে থাকে আজাদ হিন্দ ফৌজে। মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নামে রেজিমেন্ট গঠিত হয়।

পূর্ব্ব-এসিয়ার নারীরাও নীরব ছিলেন না। তাঁরাও দলে দলে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের সদস্যা হলেন। এঁদের নিয়ে আরম্ভ হল নারীবাহিনী গঠনের কাজ।

৯ই জুলাই সিঙ্গাপুরে এক বিরাট জনসভায় সুভাষচন্দ্র তাঁর ভারত-ত্যাগের উদ্দেশ্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতের ভিতরের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে বৃটিশ শক্তির ওপর আঘাত হেনে ভারতকে স্বাধীন করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। এই জন্য তিনি তিন লক্ষ সৈন্য ও তিন কোটী ডলার সংগ্রহের এক আবেদন জানালেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, কেবল পুরুষদের নিয়েই আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হবে না। তিনি ভারতীয় নারীদের নিয়ে এক মৃত্যুভয়হীন দুর্ব্বার নারীবাহিনী গড়ে তুলতে চান—১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীর নায়িকা ঝাঁসীর রাণীর মতই এরা নির্ভয়ে অস্ত্রচালনা করবেন।

চিরতরুণ নেতাজী তরুণদের কথা সর্ব্বদাই ভাবতেন। তাই তাদের নিয়ে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজে এক কিশোর-সেনাদল গঠন করেন। এই সকল কিশোরসেনা ছিল তাঁর অতিশয় প্রিয়। তিনি তাঁদের পুত্রাধিক স্নেহ করতেন। সামরিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য এই সকল কিশোরকে এক এক দলে টোকিও পাঠান হত। এমনি একদল শিক্ষার্থীর কাছে নেতাজী যে পত্র লেখেন তাতে কিশোরদের প্রতি তাঁর আন্তরিক স্নেহের একটা সুন্দর চিত্র ফুটে ওঠে। এই পত্রে বলা হয়—"আমার নিজের কোন পুত্র নেই, কিন্তু তোমরা আমার কাছে পুত্রের চেয়েও বেশী। কারণ তোমরা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করছ। আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ভারতমাতার মুক্তি। আমার বিশ্বাস, ভারতমাতার প্রতি তোমাদের নিষ্ঠা থাকবে অবিচল। বিদায়ের পূর্ব্বে তোমাদের সঙ্গে আর একবার দেখা হল না বলে বড় দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু তোমরা তো জান আমি সর্ব্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি। ভগবান তোমাদের আশীর্ব্বাদ করুন। জয় হিন্দ।"

অসাধারণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে কাজ চলতে লাগল। চারদিকেই সাজ সাজ রব। ১৯৪৩ সালের ২৫শে আগষ্ট তারিখে নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করলেন। এই উপলক্ষে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজকে উদ্দেশ করে বলেন—"অনাবিল জাতীয়তাবোধ, ন্যায় ও নিরপেক্ষতার উপরই আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে উঠতে পারে।

আমি সেই ভাবেই কাজ করব। সহস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে চলতে হবে আমাদের। ভারতের স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের পণ—'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।' পৃথিবীতে আজ এমন কোন শক্তি নাই যে ভারতবাসীকে স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখতে পারে। কাজ আমাদের সুরু হয়ে গেছে। 'দিল্লী চল' রণহুঙ্কারে আমরা যাত্রা করি এস। দিল্লীর লাল কেল্লা জাতীয় পতাকায় শোভিত না হওয়া পর্য্যন্ত—লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের দৃপ্ত বিজয়োৎসব না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের বিরাম নাই।"

১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর তারিখে নেতাজী সিঙ্গাপুরে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের এক মহান আধিবেশনে ঘোষণা করলেন স্বাধীনভারত-সরকার গঠনের কথা। প্রায় দশ-বারো হাজার লোকের এক বিরাট জনতার সমক্ষে শপথ গ্রহণ করে আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রিগণ কার্য্যভার গ্রহণ করলেন। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সেই বিরাট জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে সুভাষচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করলেন—"ভগবানের নামে আজ এই পবিত্র শপথ গ্রহণ করছি যে, আমি শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ভারতের ও আমার ৩৮ কোটী দেশবাসীর মুক্তির জন্য সংগ্রাম করব। ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের পরও আমি এই শপথ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য দেহের শেষ শোণিতবিন্দু দানে প্রস্তুত থাকব।"

আনন্দোন্মত্ত জনতা পূর্ব্ব-এসিয়ার দিগন্ত প্রকম্পিত করে

জয়ধ্বনি করে উঠল—"সুভাষচন্দ্র বসু কি জয়!—আর্জ্জিহুকুমৎ আজাদ হিন্দ কি জয়!"

আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্ট গঠিত হল এই ভাবে ঃ

সুভাষচন্দ্র বসু—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সমর ও পররাষ্ট্রসচিব এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান সেনাপতি।

লেঃ কর্নেল এ. সি. চাটার্জ্জি—অর্থসচিব।

এম. এ. আয়ায়—প্রচারসচিব।

লেঃ কর্ণেল ডাঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথন—নারীসংগঠন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

সশস্ত্রবাহিনীর প্রতিনিধি—লেঃ কঃ আজিজ আহম্মদ, লেঃ কঃ এন. এস্. ভগত, কর্নেল জে. কে. ভোঁসলা, লেঃ কঃ গুলজার সিং, লেঃ কঃ এম. জেড্. কিয়ানী, লেঃ কঃ এ. পি. লোকনাথন, লেঃ কঃ আহ্সান কাদির, কর্নেল শাহনওয়াজ। এ. এম. সহায়—সেক্রেটারী (মন্ত্রীর সমমর্য্যাদাসম্পন্ন)। রাসবিহারী বসু—প্রধান পরামর্শদাতা। পরামর্শদাতৃমণ্ডলী—করিম গনি, দেবনাথ দাস, ডি. এম. খান, এ. ইয়েলাপ্পা, জে. থিবি, সর্দ্দার ঈশ্বর সিং। এ. এন. সরকার—আইনবিষয়ক পরামর্শদাতা।

আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মন্ত্রিসভার সকল সদস্যের এক ঘোষণা প্রচার করা হয়। এই ঘোষণায় বলা হয় ঃ—"১৭৫৭ সালে বাংলায় বৃটিশের নিকট প্রথম পরাজয়ের পর প্রথম একশত বৎসর কাল ভারতীয়গণ যে সংগ্রাম চালায় সেই সংগ্রামের নায়করূপে বাংলায় সিরাজউদ্দৌলা ও মোহন-

লাল, দক্ষিণ-ভারতে হায়দার আলি, টিপু সুলতান ও ভেলু তাম্পি, মহারাষ্ট্রে আপ্পা সাহেব ভোঁসলা ও পেশোয়া বাজীরাও, অযোধ্যার বেগম, পঞ্জাবের শ্যাম সিং আতরওয়ালা, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই, তাঁতিয়া টোপি, ডুমরাওনের মহারাজা কুনোয়ার সিং, নানাসাহেব প্রভৃতি বীরগণের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

"১৮৫৭ সালে বৃটিশ বলপ্রয়োগ ক'রে ভারতীয়দের নিরস্ত্র করে ও বিভীষিকাময় নির্য্যাতন চালায়। ফলে ভারতীয়গণ কিছুকাল নিস্তেজ হয়ে পড়ে। কিন্তু ১৮৮৫ অব্দে ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জাতীয় জীবনে আসে এক নূতন জাগরণ। সেই থেকে প্রথম মহাসমর পর্য্যন্ত ভারতীয় জনগণ স্বাধীনতালাভের চেষ্টায় সর্ব্বপ্রকার পন্থার আশ্রয় নিয়েছে—আন্দোলন, প্রচারকার্য্য, বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন, সন্ত্রাসবাদ, নাশকতা ও সশস্ত্র বিপ্লব পর্য্যন্ত। সমস্ত ব্যর্থ হল—চারিদিকে নৈরাশ্যের অন্ধকার। সেই সময় অসহযোগ আইন-অমান্য এই দুটি অস্ত্র নিয়ে ১৯২০ সালে জাতির পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন মহাত্মা গান্ধী। ভারতের গৃহে গৃহে পৌঁছাল স্বাধীনতার বাণী। জাতির রাজনৈতিক চেতনা নবভাবে জাগ্রত হল। এই ভাবে কেটে গেল বিশ বৎসর। এল দ্বিতীয় মহাসমর। বৃটিশ শক্তি আজ জার্ম্মানী ও জাপানের আঘাতে জর্জ্জরিত। স্বাধীনতা অর্জ্জনে ভারতের এই মহাসুযোগ।

"স্বাধীনতা আজ সমাগত। ভারতীয় জনগণের কর্ত্তব্য

একটা অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করে চূড়ান্ত সংগ্রামের সূচনা করা। কিন্তু ভারতের সমস্ত নেতা আজ কারারুদ্ধ। ভারতবাসী নিরস্ত্র। অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করে এখন ভারতে কাজ করা সম্ভব নয়। কাজেই বৃটিশ ও তার মিত্রপক্ষীয়দের ভারতভূমি হতে বিতাড়নের সংগ্রাম আরম্ভ ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করবে এই অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার। তারপর অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট ভারতীয় জনগণের ইচ্ছানুযায়ী তাদের আস্থাভাজন স্থায়ী জাতীয় গভর্নমেণ্ট গঠনে সচেষ্ট হবে। এই স্থায়ী গভর্নমেণ্ট গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত কাজ চালাবে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার। আমাদের এই অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট প্রত্যেক ভারতীয়ের আনুগত্যলাভের অধিকার রাখে ও তা দাবী করে। এই গভর্নমেণ্ট প্রত্যেক নাগরিককে ধর্ম্মীয় স্বাধীনতা, সমান অধিকার ও সমান সুযোগ দানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।”

আজাদ হিন্দ সরকারের উনিশটি বিভাগ সুচারুরূপে শাসন-কাজ চালাতে থাকে। ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের কাজও চলে পূর্ণোদ্যমে। এই সঙ্ঘের মালয়ে ৭০টি, ব্রহ্মদেশে ৮০টি, এবং শ্যামে ২৪টি শাখা ছিল। এ ছাড়া যবদ্বীপ, সুমাত্রা, সেলিবিস, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ইন্দোচীন, চীন, মাঞ্চুরিয়া এবং জাপানেও সঙ্ঘের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শাখাগুলি আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য লোক ও অর্থ সংগ্রহ এবং সমাজসেবায় মনোনিবেশ করে। আজাদ হিন্দ সরকার স্বাধীন সরকারের সমস্ত কর্ত্তব্যই সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করতে থাকে।

আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার তৃতীয় দিবসে জাপ গভর্নমেণ্ট আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকার করেন। জাপ গভর্নমেণ্টের ঘোষণায় বলা হয়, "জাপ গভর্নমেণ্ট সুভাষচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টকে স্বীকার করছে এবং ঘোষণা করছে যে, এই গভর্নমেণ্টের উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য যথাশক্তি সাহায্য করবে।" এই দিনই আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্ট বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে। আজাদ হিন্দ সরকার অতঃপর আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জার্ম্মানী, ইতালী, জাপান, শ্যাম, ফিলিপাইন, ক্রোসিয়া, মাঞ্চুরিয়া, ব্রহ্মদেশ ও আয়ার্ল্যাণ্ড এই নয়টি রাষ্ট্র আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টকে স্বীকার করে এবং তার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে।

আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনে, সামরিক শিক্ষাদানে ও রণ-পরিচালনায় যে সকল সেনানী অপূর্ব্ব সংগঠনশক্তির পরিচয় দিয়েছেন এখানে তাঁদের কয়েকজনের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে কর্নেল ভোঁসলা, মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান, লেঃ কর্নেল সেহগল, মেজর ধীলন ও লেঃ কর্নেল লক্ষ্মী স্বামীনাথনের নাম সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে।

মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ :—আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের মধ্যে ইনি অসাধারণ প্রতিভাশালী যোদ্ধা। ইনি প্রথমে বৃটিশ বাহিনীতে ক্যাপ্টেনের পদে ছিলেন ; বৃটিশ বাহিনী যখন জাপ আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় মালয় থেকে সরে
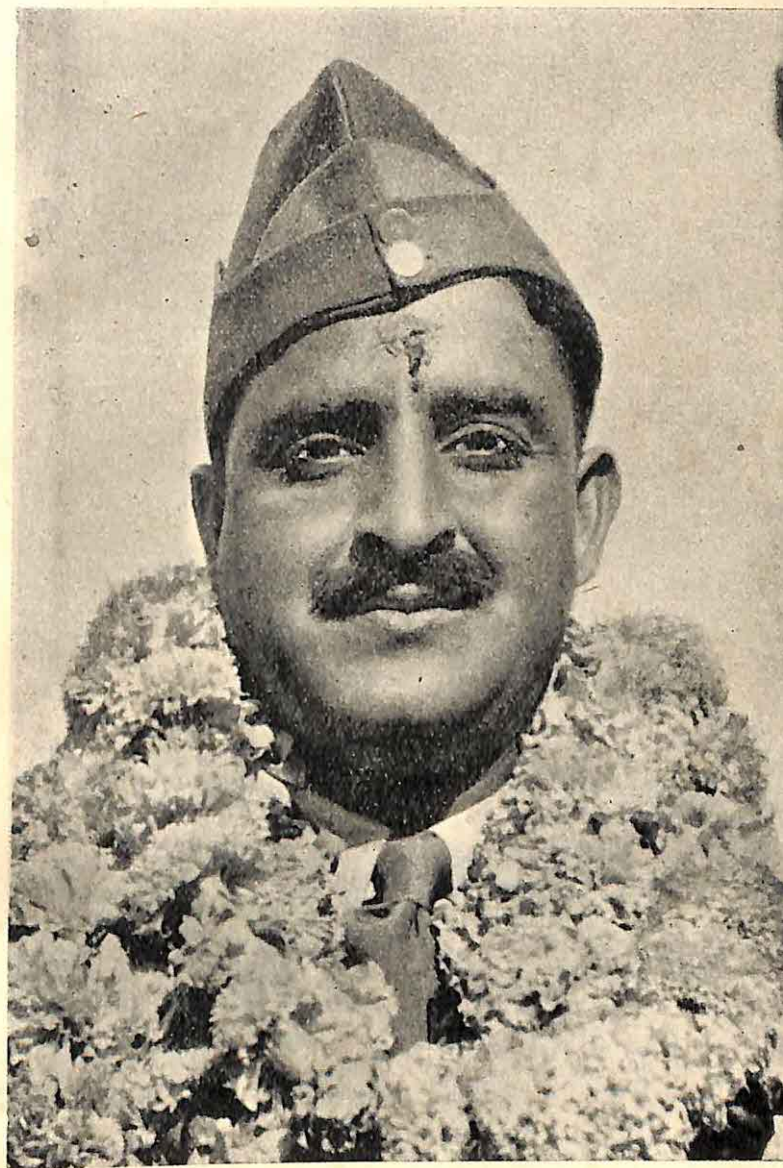
মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ
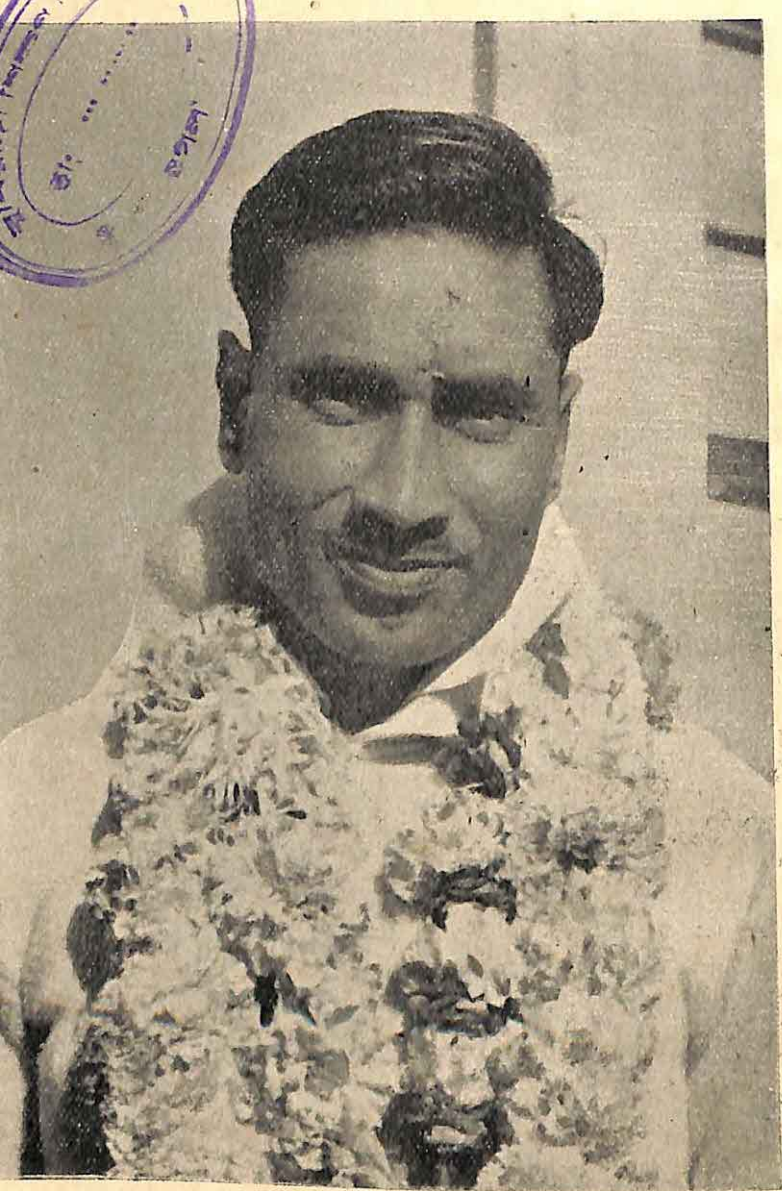
লেঃ কর্নেল ধীলন (১৯৪৬ সালে গৃহীত ফটো হইতে)

পড়ে, ইনি তখন পরিত্যক্ত হন। ক্যাপ্টেন মোহন সিংএর নেতৃত্বে প্রথম দফায় যখন স্বাধীনভারত-বাহিনী গঠিত হয় তখনও ইনি সেনানায়কের পদে ছিলেন এবং প্রথম দফায় বাহিনী ভেঙ্গে গেলে ইনি তা পুনর্গঠনেরও চেষ্টা করেন। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ নবভাবে গঠিত হলে ইনি আজাদ হিন্দ মন্ত্রিসভায় মিলিটারী সেক্রেটারীর পদ পান এবং মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন। মণিপুরের যুদ্ধে ইনি সুভাষ ব্রিগেডের সেনাপতিরূপে ইম্‌ফলের উপর আক্রমণ চালান এবং ভারতভূমিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষ থেকে সর্ব্বপ্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এঁর তেজস্বিতা ও দেশপ্রেম অনন্যসাধারণ। ইনি লাহোরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের সন্তান। এই পরিবারের ৬২ জন লোক বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীতে যোগ দেন। ইনি আজাদ হিন্দ ফৌজের বহু সেনানীকে শিক্ষা দান করেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারার্থে গঠিত প্রথম সামরিক আদালতে এঁর বিচার হয়। বর্ত্তমানে ইনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়ে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠনের ভার নিয়েছেন।

জগন্নাথ রাও ভোঁসলা ঃ—ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জগন্নাথ রাও সেই ইতিহাস-খ্যাত ভোঁসলা বংশের সন্তান। ভারতীয় রাজকুমারদের জন্য নির্দ্দিষ্ট দেরাদুন মিলিটারী কলেজে ও বিলাতের স্যাণ্ডহার্ট কলেজে

শিক্ষা শেষ করে ইনি ল্যাঙ্কাশায়ার রেজিমেণ্টে যোগ দেন। এই রেজিমেণ্টের সঙ্গে ইনি কোয়েটায় আসেন এবং কিছুদিন পরে রয়েল মারাঠা ইনফ্যানট্রি সেনাদলে ভর্ত্তি হন। নিজ প্রতিভাবলে ইনি দ্রুত উন্নতিলাভ করতে থাকেন এবং লেঃ কর্নেলের পদে উন্নীত হন। সিঙ্গাপুরের পতনের সময় ইনি তথাকার বৃটিশ জেনারেল ষ্টাফের অন্যতম সদস্য ছিলেন। সিঙ্গাপুরের পতনের পর আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হ'লে ইনি চীফ অফ ষ্টাফ পদে নিযুক্ত হন। সামরিক পদমর্য্যাদায় নেতাজীর পরই এঁর স্থান ছিল। ইনি আজাদ হিন্দ ফৌজের হাজার হাজার সেনানীকে সামরিক শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলেন। রেঙ্গুনের পতনের পর তিনি ব্যাঙ্ককে বৃটিশ হস্তে বন্দী হন।

প্রেমকুমার সেহগল :—ইনি লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি অচ্ছুরামের পুত্র। ইনি প্রথমে বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীতে যোগ দেন এবং দশম বালুচ রেজিমেণ্টে ক্যাপ্টেনের পদ পান। আজাদ হিন্দ ফৌজে ইনি লেঃ কর্নেলের পদে উন্নীত হন। আসাম ও ব্রহ্ম রণাঙ্গণে ইনি বিশেষ রণ-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারার্থ প্রথম সামরিক আদালতে এঁরও বিচার হয়।

গুরুবক্সসিং ধীলন :—পঞ্চনদীতীরের বীর শিখ-বংশের সন্তান ধীলন আজাদ হিন্দ ফৌজে অদ্ভুত সাহসিকতার জন্য খ্যাতিলাভ করেন। ১৯৩৫ সালে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৩৭ সালে

লেঃ কর্নেল সেহগল

লেঃ কর্নেল ডাঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথন

কমিশন পাবার পর দেরাদুন ও নওগজ সামরিক শিক্ষালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে ইনি পাঞ্জাব রেজিমেণ্টে ভর্ত্তি হন। ভারতীয় বৃটিশ বাহিনীর হয়ে ইনি মালয়ে যুদ্ধ করতে যান এবং সিঙ্গাপুরের পতনের পর পরিত্যক্ত হয়ে জাপ-হস্তে যুদ্ধবন্দী হন। ক্যাপ্টেন মোহন সিংএর নেতৃত্বে প্রথম দফায় যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয় ইনি সেই সময় ব্যাঙ্কক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীতে ইনি লেফটেন্যাণ্টের পদ পান এবং আজাদ হিন্দ ফৌজে মেজর পদে উন্নীত হন। বর্ম্মার যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের পরাজয়ের পরে ইনি বৃটিশ-হস্তে বন্দী হন। প্রথমে পেগু ও পরে রেঙ্গুনে জেলে আটক রেখে এঁকে ভারতে পাঠান হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারার্থ গঠিত প্রথম সামরিক আদালতে এঁরও বিচার হয়।

লেঃ কর্নেল লক্ষ্মী স্বামীনাথন :—ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর অধিনায়িকা লক্ষ্মী মাদ্রাজের এক অভিজাত ঘরের মেয়ে। এঁর পিতা ছিলেন মাদ্রাজের নামকরা ব্যারিষ্টার এবং মাতা অম্মু স্বামীনাথন কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট সদস্যা এবং ভারতীয় আইনসভায় কংগ্রেসী সদস্যা। ডাক্তারি পাশ করে লক্ষ্মী সিঙ্গাপুরে যান এবং অল্পকালের মধ্যেই ডাক্তার হিসাবে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনর্গঠনের ভার নিয়ে যখন নারীবাহিনী গঠনের অভিলাষ ঘোষণা করেন লক্ষ্মী তখন নারীবাহিনীতে যোগ দেন এবং বাহিনীর অধিনায়িকা

মনোনীত হন। সামরিক বাহিনীতে ইনি লেঃ কর্নেলের পদে উন্নীত হন এবং আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টে নারী-সংগঠন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর পদ লাভ করেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের পরাজয়ের পর এঁকে রেঙ্গুনে আটক করা হয়। ১৯৪৬ সালের মার্চ্চ মাসে মুক্তি পেয়ে ইনি ভারতে ফিরে আসেন।

এদিকে সেনা-সংগ্রহ ও তাদের শিক্ষাদান চলতে থাকে দ্রুতগতিতে। নয়টি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়। ভারতীয় সেনানীরাই এদের শিক্ষার ভার নেন। শিক্ষাশিবিরগুলিতে একসঙ্গে সাত হাজার সৈন্যকে শিক্ষা দেওয়া হত। সেনানীদের জন্যও সিঙ্গাপুরে একটি ও পরে রেঙ্গুনে একটি শিক্ষাশিবির খোলা হয়। নারীবাহিনীর জন্য সিঙ্গাপুরে একটি ও রেঙ্গুনে দুটি শিক্ষাশিবির খোলা হয়। ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকাই আজাদ হিন্দ ফৌজের পতাকা বলে গৃহীত হয়। নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদিগকে দীক্ষিত করলেন 'জয় হিন্দ' মন্ত্রে। 'জয় হিন্দ' বলেই সকলে পরস্পরকে অভিবাদন করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে এই রীতি সমগ্র পূর্ব্ব-এসিয়ায় পরিব্যাপ্ত হয়।

আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তখন এর সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ষাট হাজার এবং সেনানীর সংখ্যা পনেরো শত। আজাদ হিন্দ ফৌজে পাঁচটি রেজিমেণ্ট ছিল: (১) সুভাষ

রেজিমেণ্ট, (২) গান্ধী রেজিমেণ্ট, (৩) নেহরু রেজিমেণ্ট, (৪) আজাদ রেজিমেণ্ট, (৫) ঝাঁসীর রাণী রেজিমেণ্ট।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর-সঙ্গীত আজ ভারতের ঘরে ঘরে গীত হয়—"কদম কদম বঢ়ায়ে যা" গানে রণযাত্রার একটা ঝঙ্কার বেজে ওঠে যেন।

একটা স্বাধীন সরকার ও সেনাবাহিনী পরিচালনার ব্যয় বিরাট। সুভাষচন্দ্রের আবেদনে ভারতীয়গণ মুক্তহস্তে অর্থ-সাহায্য করতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় আট কোটী টাকা সংগৃহীত হয়। বড় বড় ব্যবসায়ী ও জমিদারেরা তাঁদের যথাসর্ব্বস্ব আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে তুলে দেন স্বেচ্ছায়। রেঙ্গুনের এক ব্যবসায়ী প্রায় ৬৩ লক্ষ টাকা এবং ব্রহ্মের জেয়াবাদী গ্রামের এক জমিদার কয়েক কোটী টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করেছিলেন। সভায় সুভাষচন্দ্রের গলার মালা বিক্রি করা হত। এক লক্ষ, দু' লক্ষ, তিন লক্ষ, এমন কি বারো লক্ষ টাকা মূল্যে একখানা মালা বিক্রি হয়েছে। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে স্বাধীনতা-দিবসে মালয়ের ভারতীয়গণ ৪০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে সুভাষচন্দ্রকে উপহার দেন। রেঙ্গুনের এক ক্রোড়পতি মুসলমান ব্যবসায়ীর সাহায্যে আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ম্মায় এই ব্যাঙ্কের কয়েকটি শাখাও খোলা হয়। এই ব্যাঙ্কে নেতাজী তহবিলের প্রায় কুড়ি কোটী টাকা এবং ব্যক্তিগত আমানত বাবদ প্রায় অর্দ্ধলক্ষ টাকা জমা হয়। এইভাবে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন গভর্নমেণ্টের

সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন করে আজাদ হিন্দ সরকার যুদ্ধোদ্যমে প্রবৃত্ত হয়।

১৯৪৪ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে আজাদ হিন্দ সরকারের রাজধানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের হেডকোয়ার্টার রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করা হয়। সিঙ্গাপুরে রইল পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হেডকোয়ার্টার। নেতাজী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ; কিন্তু সাধারণ সৈনিকের মত তিনি সকলের সঙ্গে মেশেন। প্রত্যেকের প্রতি তাঁর মমতা ও ভালবাসা তাদের মনোবল বাড়িয়ে দেয় হাজারো গুণে। নেতাজীর নেতৃত্বে যে তারা ভারতকে স্বাধীন করতে পারবে সে বিষয়ে তারা দৃঢ়নিশ্চিত। আর আর সেনাপতিদের মধ্যে মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ, মেজর জেনারেল ভোঁসলে, কর্নেল সেহগাল, মেজর ধীলন, ক্যাপ্টেন কিয়ানী প্রভৃতির নাম সকলের মুখে মুখে ফিরতে থাকে। নারীবাহিনীর অধিনায়িকা লেঃ কর্নেল লক্ষ্মী স্বামীনাথনও তাঁর বাহিনীকে রণক্ষেত্রে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হন।

অভিযান আরম্ভের পূর্ব্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের সমস্ত সৈন্য ও সেনানায়কদের এক বিরাট সমাবেশ হল। এই সমাবেশে সৈনিকদের আহ্বান করে সুভাষচন্দ্র যে বাণী দেন তাতে তাদের উদ্দীপনা শতগুণে বেড়ে যায়। নেতাজী আবেগভরা কণ্ঠে তাদের বললেন—"ঐ দূরে, ঐ নদী ছাড়িয়ে, ঐ অরণ্যানী ও পর্ব্বতমালার পারে আমাদের চিরবাঞ্ছিত জন্মভূমি। আমরা

আবার ফিরে যাচ্ছি সেই মাটিতে। শোন, ভারতভূমি আজ আমাদের ডাক দিয়েছে—রাজধানী দিল্লী আমাদের আহ্বান করেছে। আমাদের ৩৮ কোটি দেশবাসী আহ্বান জানাচ্ছে—এ যে একই রক্তের আহ্বান।

"ওঠ! আর নষ্ট করবার সময় নেই—হাতে হাতে অস্ত্র নিয়ে এস! সম্মুখে তোমার দীর্ঘ পথ। পূর্ব্বগামীরা যে পথ রেখে গেছেন সেই পথে এগিয়ে চল। শত্রুর দুর্ভেদ্য ব্যূহের মধ্য দিয়ে আমাদের পথ করে যেতে হবে। ঈশ্বরের অভিপ্রেত হলে শহীদের মত মৃত্যুবরণেও আমরা কুণ্ঠিত নই। যে পথ ধরে আমাদের বীর সেনার দল দিল্লীতে উপনীত হবে সেই পথের উপর শেষ শয্যা রচনার কালে আমরা সেই পথের ধূলি চুম্বন করব। দিল্লীর পথই স্বাধীনতার পথ। চলো দিল্লী!"

'চলো চলো দিল্লী চলো'—রবে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে ছুটে চলে আজাদী সেনার দল তীরের গতিতে।

১৯৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আজাদ হিন্দ ফৌজ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। এই অভিযানের সেনাপতিত্ব দেওয়া হয় মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজের উপর। স্থির হল, আজাদ হিন্দ ফৌজ মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল আক্রমণ করবে। তদনুযায়ী আসাম-ব্রহ্ম-সীমান্তে আজাদ হিন্দ ফৌজের চারটি ব্রিগেড সমাবেশ করা হল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের স্থিরবিশ্বাস ছিল যে, তারা ইম্ফল দখল করতে পারবে। সৈন্যেরা ব্রহ্মপুত্রের তীরে পৌঁছালে

সুভাষচন্দ্র স্বয়ং সেনাপতিত্ব করবেন—এইরূপ স্থির হয়। মণিপুরে স্বাধীনভারত-বাহিনী হানা দিল। একটা অভিযান চলল ইম্ফলের দিকে, আর একটা কোহিমার দিকে। প্রথম অভিযানে আজাদ হিন্দ ফৌজ অভূতপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করে। তাদের মনোবল ও শৌর্য্যের সম্মুখে শত্রু-সেনাদল দাঁড়াতেই পারে নি। বীর গোরার দল কালা আদমী ভারতীয় সেনাদের সম্মুখে না এসে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে থাকে। ১৮ই মার্চ্চ তারিখে আজাদ হিন্দ ফৌজ মণিপুরে প্রথম ভারতভূমিতে পদার্পণ করে। ভারতভূমিতে এসে আজাদী সেনারা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ক'রে দেশমাতাকে বন্দনা করে। সেনানায়ক শাহ নওয়াজ ভারতের মাটিতে প্রথম জাতীয় পতাকা উড্ডীন করলেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজ ইম্ফল-কোহিমা সড়কেরও একাংশ দখল করে। এই সময় বৃটিশ বাহিনীর অবস্থা অতি সঙ্গীন হয়ে পড়ে। কিন্তু বিমানের অভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজ তাদের এই প্রাথমিক সাফল্য রক্ষা করতে পারল না। ৮ই এপ্রিলের মধ্যে তাদের হটে আসতে হয় কোহিমার উপকণ্ঠ থেকে। জাপবাহিনী রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ ফৌজকে রণসম্ভার বা প্রয়োজনীয় রসদ কোনটাই দিতে পারে নি।

আধুনিক অভিযানের শ্রেষ্ঠ বল বিমান-বল। বিমানের অভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজ নিজেদের অসহায় মনে করতে থাকে। অপর্য্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়েও তারা যে সংগ্রাম করে তাতে বৃটিশ ও মার্কিন সেনানায়কেরা অভিভূত হয়ে পড়েন।

ইতিমধ্যে মিত্রবাহিনী বহু বিমান ও নূতন নূতন সৈন্যদল আমদানী করতে সমর্থ হয়। পাল্টা আক্রমণ ক'রে তারা ২০শে জুনের মধ্যে সমগ্র আসাম পুনর্দখল করে।

ইম্ফল-অভিযান ব্যর্থ হলেও আজাদ হিন্দ ফৌজের মনোবল ভেঙে পড়ে নি। নূতন ভাবে সংগঠন করে তারা পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। এদিকে প্রবল বর্ষা সুরু হয়—মণিপুর অঞ্চলের প্রান্তরগুলি হয়ে ওঠে যেন এক-একটি সমুদ্র। তদুপরি খাদ্য, পোষাক ও রণসম্ভারের অভাব। এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আজাদ হিন্দ ফৌজ কোনদিন রণে ভঙ্গ দেয় নি। কিন্তু মণিপুরের যুদ্ধের পর জাপ-বাহিনীর মনোবল সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়; আজাদ হিন্দ ফৌজকেও বাধ্য হয়ে জাপ-বাহিনীর দুর্ভাগ্যের অংশ গ্রহণ করতে হয়।

১৯৪৫ সালের ২০শে মার্চ্চ তারিখে মিত্রসেনারা মান্দালয় সহর সম্পূর্ণরূপে দখল করে রেঙ্গুনের দিকে এগিয়ে যায়। রেঙ্গুনের ৫০ মাইল উত্তরে জাপ-বাহিনী শেষ সংগ্রামে পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে থাকে। আজার হিন্দ ফৌজের বহু সৈন্যও হতাশায় আত্মসমর্পণ করতে থাকে। তা' সত্ত্বেও ফৌজের একটা অংশ দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলকে আশ্রয় করে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। কিন্তু তারাও বেশী দিন আত্মরক্ষা করতে পারলে না। অবশেষে ১৯৪৫ সালের ২৮শে এপ্রিল লেঃ কর্নেল সেহগাল আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। ১৪ই মে কর্নেল ধীলন ধৃত হন এবং ১৮ই মে তারিখে মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ বন্দী হন।

সুভাষচন্দ্রের সশস্ত্র অভিযানের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই যে, আধুনিক যুগের সর্ব্বাত্মক অভিযান চালাবার মত সঙ্গতি না নিয়েই তিনি রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আশা করেছিলেন, কোন রকমে ভারতে এসে পড়লে ভারতের লোক স্বেচ্ছায় তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবে। কিন্তু তাঁর এ আশা পূর্ণ হয় নি। গোড়া থেকেই আজাদ হিন্দ ফৌজকে নানা অসুবিধায় পড়তে হয়। জাপানীদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সাহায্য পাওয়া গেল না। সৈন্যদের মধ্যে খাদ্য, পোষাক ও রণসম্ভারের অভাব দেখা দিল। তার উপর সুরু হল প্রবল বর্ষা। আসাম ও মণিপুরের এ অঞ্চল বেশী বর্ষাতে একেবারে দুর্গম হয়ে উঠল। ওদিকে বিমান-বলে বলীয়ান হয়ে মিত্র-বাহিনী হানতে থাকে প্রচণ্ড আক্রমণ। সে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হলে চাই বিমান —কিন্তু একখানা বিমানের সাহায্যও আজাদ হিন্দ ফৌজ পায় নি।

এ অভিযানে ব্যর্থতার একমাত্র কারণ বিমানের অভাব— আজাদ হিন্দ বাহিনীর মনোবল বা বাহুবলের অভাব নয়। শৌর্য্যে, বিক্রমে, ধৈর্য্যে ও নিয়মনিষ্ঠায় এই আজাদ বাহিনী নেতাজীর এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। খাদ্য নেই, পোষাক নেই, পর্য্যাপ্ত সমরোপকরণ নেই—তা সত্ত্বেও খণ্ড খণ্ড সম্মুখযুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যেরা যে শৌর্য্য ও সাহসিকতার পরিচয় দেয়, স্বাধীনতার উদগ্র আকাঙ্ক্ষার ফলেই তা সম্ভব। বিশ্বের

ইতিহাসে এদের এই বীরত্বের তুলনা নেই। আজাদ হিন্দ বাহিনীর বীরত্বকাহিনী চিরদিন স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

ঝাঁসীর রাণী বাহিনী ও কিশোরসেনার দলও আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধে একটা প্রধান অংশ গ্রহণ করে এবং অপূর্ব্ব বুদ্ধিমত্তা, নৈপুণ্য ও সাহসিকতার পরিচয় দেয়। এই দুই বাহিনীই যে-কোন দেশের গৌরবের বস্তু। আজাদ হিন্দ ফৌজের এই দুই বাহিনীর কীর্ত্তিকলাপও ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

... ...

১৯৪৫ সালের ২৩শে এপ্রিল তারিখে রেঙ্গুনস্থ জাপ সেনাপতি তাঁর দলবল নিয়ে ব্রহ্মের রাজধানী পরিত্যাগ করলেন। সুভাষচন্দ্র তাঁদের সঙ্গে যেতে রাজী হলেন না। আসামের যুদ্ধে জাপানীদের ব্যবহারে তিনি খুব মর্ম্মাহত হয়েছিলেন। তাঁর স্বাধীন মতবাদ, রাজনৈতিক প্রতিভা ও বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে জাপ কর্ত্তাদের সর্ব্বদাই বশ্যতা স্বীকার করতে হত বলে, তাঁরাও নেতাজীকে এড়িয়ে চলতে চাইতেন। বহু ভাবে চেষ্টা করেও তাঁরা নেতাজীর উপর কোন দিন কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারেন নি। ভারতের ব্যাপারে তিনি কোন বিদেশীর সর্দ্দারী সহ্য করতে পারতেন না।

১৯৪২ সালে জাপানীরা যখন বর্ম্মা দখল করে, তখন দেশে যে ভীষণ অরাজকতা দেখা দিয়েছিল, তাতে লক্ষ লক্ষ নিরীহ

লোককে প্রাণ দিতে হয়। এবার যাতে বর্ম্মাতে সেরূপ কোন অরাজকতা দেখা না দেয়, সেজন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের এক সেনাদলের উপরে রেঙ্গুন-রক্ষার ভার দিয়ে ২৪শে এপ্রিল তারিখে নেতাজী রেঙ্গুন ত্যাগ করেন। যাবার আগে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশ্যে শেষ বাণী দিয়ে যান—"ইম্‌ফল ও ব্রহ্মদেশে আমাদের স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এ তো সবে সূচনামাত্র। আমাদের আরও অনেক যুদ্ধ করতে হবে। চির-আশাবাদী আমি, কোন অবস্থাতেই আমি পরাজয় স্বীকার করি না। ইম্‌ফলের উপত্যকায়, আরাকানের অরণ্যে, ব্রহ্মের তৈলখনি-এলাকায় ও অন্যান্য স্থানে তোমাদের ধারাবাহিক সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ!"

ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর ৬০ জন বীরাঙ্গনা ও প্রায় একশত সৈন্য নিয়ে বিঘ্নসঙ্কুল পথে সুভাষচন্দ্র ১৫ দিন পরে ব্যাঙ্ককে উপনীত হন। এইখানেই আজাদ হিন্দ ফৌজের হেড কোয়ার্টার স্থানান্তরিত হয়।

১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে জাপানের আত্মসমর্পণের পরে মিত্রপক্ষের সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে আজাদী সেনারা অস্ত্রত্যাগ করে। যতদূর জানা যায়, ব্যাঙ্ককে আজাদ হিন্দ ফৌজের দুই হাজার সৈন্য ছিল। এইখানেই আজাদ হিন্দ ফৌজের চীফ্‌-অব-ষ্টাফ জেনারেল জগন্নাথ রাও ভোঁসলা

বৃটিশের হাতে বন্দী হন। যুদ্ধে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর কি পরিমাণ সৈন্য ক্ষয় হয়েছে এখনও তা সঠিক ভাবে জানা যায় নি। তবে মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় যে, প্রায় সাড়ে তিন হাজার আজাদী সেনা হতাহত হয়েছে।

রেঙ্গুন থেকে ব্যাঙ্ককে সরে আসবার পর থেকে নেতাজীর গতিবিধি সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। ১৯৪৫ সালের ২৩শে আগষ্ট তারিখে জাপ সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান অকস্মাৎ সংবাদ দেয় যে, ১৮ই আগষ্ট তারিখে এক বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী নিহত হন। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত সারা ভারতের লোককে এই সংবাদ স্তম্ভিত করে দেয়। অতি আপনার জনকে হারানোর তীব্র ব্যথা অনুভব করে তারা অন্তরে অন্তরে। তারা এ সংবাদ বিশ্বাস করতে চায় না—বিশ্বাস করতে পারে না। ১৯৪২ সালের ২৮শে মার্চ্চ তারিখেও আর একবার তো তাঁর মৃত্যুর সংবাদ রটেছিল। সকলেরই আন্তরিক কামনা—এ সংবাদ মিথ্যা হোক, প্রিয় নেতাজী আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসুন।

নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে সরকারী ইস্তাহারে প্রচারিত সংবাদে বলা হয় '১৮ই আগষ্ট তারিখে তিনখানা বিমানে স্বাধীন ভারত গভর্নমেণ্টের কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য ও জাপ সেনানীদের নিয়ে সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুর থেকে টোকিও যাত্রা করেন। পথে বিমানগুলি ফরমোজার তাইহোকু বিমানঘাঁটিতে নামে। সুভাষ যে বিমানে ছিলেন, আকাশে উঠলে সেই

বিমান বিকল হয়ে যায় এবং পাক খেতে খেতে মাটিতে পড়ে যায়। তাঁর দেহে এমন ভীষণ আঘাত লাগে যে, তাঁর আর বাঁচবার কোন আশা ছিল না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাইহোকুর এক হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু ঘটে। কর্নেল হবিবুর রহমানও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একই বিমানে ছিলেন। তিনিও আহত হন, কিন্তু তাঁর প্রাণরক্ষা পায়।

কিন্তু এই বিমান-দুর্ঘটনা সম্বন্ধে কর্নেল হবিবুর রহমানের নিজের মুখের কাহিনী, আজাদ হিন্দ ফৌজের বিশিষ্ট নেতাদের অভিমত ও নানা গুজব নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদের উপরে এমন একটা রহস্যের জাল বুনেছে যে, কোন দিন তা অপসারিত হবে কিনা জানি না। তবে একথা ঠিক যে, তিনি চিরদিন দেশবাসীর অন্তরে ভক্তি-শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন—দেশের মুক্তিসাধক শ্রেষ্ঠ বীর নায়করূপে।

এদিকে ব্রহ্ম ও মালয় অধিকার করে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক ও সেনানীদের বন্দী করলেন। মালয়, ব্রহ্ম ও ভারতের বন্দীশালায় আটক করা হল তাঁদের। সরকারী বিবৃতিতে সাড়ে উনিশ হাজার আজাদী সৈন্যকে আটক করার কথা বলা হয়। তার মধ্যে এগার হাজার তিন শত সৈনিকের তদন্ত করে ছেড়ে দেওয়া হয়, আড়াই হাজার সৈনিককে বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীতে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়। প্রধান প্রধান সেনানীদের বিচারের জন্য নয়টি সামরিক আদালত গঠন করা হয়। যে লাল কেল্লায় বিজয়ী

বীরের বেশে তাঁদের আসবার কথা ছিল, সেই লাল কেল্লাতেই বসে তাঁদের বিচার-সভা। এই সমস্ত বিচারের সময় সমগ্র ভারতে প্রবল গণ-আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এঁদের পক্ষ সমর্থন করেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহায্যের জন্য কংগ্রেসের তরফ থেকে সাহায্যভাণ্ডার খোলা হয়। ভারতের জনসাধারণ মুক্তহস্তে দান করে এই তহবিলে, বীরের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় তারা অর্থের উপচারে। প্রবল গণমতের চাপে অধিকাংশ সেনানীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হ'লেও, সরকার কয়েক জনের প্রতি কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

১৯৪৫ সালের পর থেকে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে দ্রুত পটপরিবর্ত্তন হচ্ছে। ভারতের ভিতরে কংগ্রেসের আন্দোলন এবং ভারতের বাইরে আজাদ হিন্দ ফৌজ আন্দোলন তাকে স্বাধীনতার দ্বারে সমুপস্থিত করেছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট বৃটেন ভারতের হাতে ডোমিনিয়ান শাসনের অধিকার দিতে বাধ্য হয়েছে। নূতন ভারত সরকার আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু ভারতের সেনাবাহিনীতে তাদের গ্রহণ করা হবে না বলে ভারত সরকার যে ঘোষণা করেছেন তা সমর্থনযোগ্য নয়। স্বাধীন ভারতের মর্য্যাদা রক্ষার মহান দায়িত্ব গ্রহণে তাদের আহ্বান করলেই বীরের সম্মান করা হত। আশা করি ভারত সরকার এ বিষয়ে আরও উদার নীতি অবলম্বন করবেন।

নেতাজী, আজ তুমি কোথায় জানি না। তবে তোমার স্বপ্ন আজ সার্থক হতে চলেছে, এইটুকু জানি। যে লাল কেল্লায় তুমি আজাদ হিন্দ ফৌজের সমাবেশ করতে চেয়েছিলে সেই লাল কেল্লা আজ ভারতীয় বাহিনীরই হেড কোয়ার্টার হয়েছে। পত্-পত্ শব্দে ত্রিবর্ণ পতাকা লাল কেল্লার শীর্ষদেশের শোভ বর্দ্ধন করছে; তবু যেন আমরা সব কিছু পাই নি। পূর্ণ স্বাধীনতাই ছিল তোমার লক্ষ্য। ডোমিনিয়ান শাসনের বিরুদ্ধে তোমার অস্ত্র ছিল সর্ব্বদাই উদ্যত। ভারতে আজ তোমার বড় প্রয়োজন—

অবনত ভারত চাহে তোমারে—এস প্রহরণধারী নেতাজী।

জয় হিন্দ্

আজাদ হিন্দ ফৌজের রণসংগীত—

কদম কদম বঢ়ায়ে যা,
খুশীকে গীত গায়ে যা।
য়হ জিন্দগী হৈ কৌম কী,
(তো) কৌম পর লুটায়ে যা॥
তুঁ শেরে-ই-হিন্দ আগে বঢ়,
মরণসে ফির ভী তুঁ ন ডর।
আসমান তক্ উঠাকে শির,
জোশে বতন বঢ়ায়ে যা॥

তেরী হিম্মৎ বাঢ়তী রহে,
খুদা তেরী সুনতা রহে।
যো সামনে তেরে চঢ়ে,
তো খাঁকসে মিলায়ে যা॥
চলো দিল্লী পুকারকে,
কৌম-ই নিশান সম্হালকে।
লাল কিল্লে পর গাড়্কে,
লহরায়ে যা, লহরায়ে যা॥

জয় হিন্দ্

আজাদ হিন্দ সরকারের জাতীয় সংগীত—

সব সুখ চায়েন কী বরখা বরষে ভারত ভাগ্ হ্যায় জাগা।
পঞ্জাব, সিন্ধ, গুজরাট, মারহাটা, দ্রবিড়, উৎকল, বঙ্গা,
চঞ্চল সাগর, বিন্ধ্য হিমালা, নীলা যমুনা গঙ্গা
তেরে নিত গুণ গায়েঁ তুঝসে জীওন পায়েঁ
সব তন পায়েঁ আশা।

সূরয বন্কর জগপর চমকে, ভারত নাম সুভাগা।
জয় হো, জয় হো, জয় হো, জয় জয় জয় জয় হো
ভারত নাম সুভাগা।

সবকে দিলমে প্রীতিরসে তেরী মিঠি বাণী
হর স্থবেকে রহনেওয়ালে, হর মজহবকে প্রাণী,
সব ভেদ ঔর ফারাক মিটাকে, সব গোদমে তেরী আয়কে
গুণ্‌ধে প্রেমকী মালা।
সূরয বন্‌কর জগপর চমকে ভারত নাম সুভাগা।
জয় হো, জয় হো, জয় হো, জয় জয় জয় জয় হো,
ভারত নাম সুভাগা।
স্থবা সবেরে পাংখা পাখেরু তেরে হি নিত গুণ গায়েঁ
রাসভরী ভরপূর হাওয়ে, জীওন মে রুৎ লায়েঁ
সব মিল কর হিন্দ পুকারে জয় আজাদ হিন্দকে নারে
পিয়ারে দেশ হমারা।
সূরয বন্‌কর জগপর চমকে ভারত নাম সুভাগা।
জয় হো, জয় হো, জয় হো, জয় জয় জয় জয় হো।
ভারত নাম সুভাগা।